দুখানি ছবি।

"মা ও ছেলে" প্রণেতা

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And wastes its sweetness in the desert-air

Elegy—Gray

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রারী হইতে

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

উৎসর্গ

লোকসেবা-ব্রত-রত ও অশেষ গুণসম্পন্ন

পণ্ডিত-পুঙ্গব

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

পবিত্র করকমলে ভক্তি, প্রীতি ও

প্রাণের সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ, এই গ্রন্থ

খানি উপহার প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

"দুখানি ছবি" প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধু-বান্ধব ও বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর করে ইহাকে অর্পণ করিবার সময়ে আমার কএকটি বক্তব্য আছে। অনেক দিন হইল, এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আমার প্রাণে উদয় হয়। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং বিধবার বিবাহের আবশ্যকতা থাকিলে, কোন্ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহাই দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই সুমহান উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইল, বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যের কাল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ তাহা বিচার করিবেন। তবে বিচার করিবার সময় আমার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন ইহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা। বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশ কোন বন্ধুর জীবনের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইল।

কার্য্যাধিক্য বশতঃ প্রুফ্ দেখিবার কিছু ত্রুটি হইয়াছে এবং তজ্জন্য কোন কোন স্থানে ভ্রম লক্ষিত হইবে।

লিকাতা
শ্রাবণ, ১২৯৫।

নিবেদক
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুখানি ছবি

উপক্রমণিকা।

.... অতি গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেক ভাল ভদ্র লোকের বাস। তন্মধ্যে কায়স্থের ভাগই অধিক। অপর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। যে সমস্ত কায়স্থ এখানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই কুলীন। সাধারণতঃ প্রায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে গ্রাম বা পল্লীতে যে জাতীয় লোকের সংখ্যা অধিক, তথায় সেই শ্রেণীর লোকের প্রভুত্বও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। রামপুরে অনেক কায়স্থ, তাঁহারা আবার কুলীন হওয়াতে, গ্রামের উপর তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব আরও অধিক। কেবল গ্রামে কেন, কায়স্থ সমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহারা বিশেষ ভাবে আদৃত। এমন কি, গ্রামে ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা ও জাত্যন্তর করার ভার এক প্রকার তাঁহাদেরই হস্তে, ইচ্ছা করিলে ইহাঁরা অনেক কায়স্থ সন্তানকে তাহাদের জাতিগত সত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে অনেক হীন বর্ণের লোককেও স্ববর্ণে উঠাইয়া লইতে পারেন। এসকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র; কারণ, বঙ্গসমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ রহস্য অবগত আছেন। এটি অতি সত্য কথা যে, অনেক লোক বল্লালের কৃপাপাত্রগণের কৃপায় উচ্চবর্ণে উন্নীত হইয়া-

ছেন এবং এক্ষণে সময় গুণে সমাজাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইতেছেন। অপর দিকে অনেক সম্ভ্রান্ত মৌলিক পরিবার কেবল দারিদ্রতা নিবন্ধন ইহাঁদের কর্ত্তৃক হীনবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছেন।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥"

বল্লাল কোন একটি বিশেষ সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। সমাজ মধ্যে বাস করিয়া আদর্শ জীবন যাপনের মূল মন্ত্র ঐ কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে নয় গুণের পরিবর্ত্তে নয় বার নবদোষসম্পন্ন ব্যক্তিও কুলীন এবং তিনি উচ্চাসনে আসীন। কৌলীন্য প্রথার বহুবিধ অনিষ্ট ফলের সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। কেবল একটি মাত্র কুফলের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিব। সচ্চরিত্র, সদাচারী, মিষ্ট-ভাষী ও ধর্ম্মশীল সৎলোক কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ, বংশ মর্য্যাদা অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথাগত সম্মান না থাকাতে সমাজ মধ্যে স্ত্রী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের মুখাবলোকন ও তজ্জনিত সুখে চিরবঞ্চিত থাকেন। কাহারও কাহারও সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া হয়ত যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর দিবস হয়ত তাঁহাকে উদরান্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি সেই গৃহসজ্জার বস্তু—বালিকা অসময়ে লোকান্তর গমন করে, তবে গৃহকর্ত্তা ধনে প্রাণে মারা যান। তাঁহার চির জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই সঙ্গে

উপক্রমণিকা।

সংসার সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়। অপর দিকে কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন মহাশয়েরা স্বেচ্ছাক্রমে অনেক গুলি বিবাহ করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় স্বামী ভরণ পোষণে অসমর্থ হইলে, স্ত্রী প্রায়ই পিত্রালয়ে বাস করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে জামাতারাও কাল বিভাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস ও শ্বশুরের অন্নে উদর পূর্ণ করিতে লজ্জিত হন না। যে দেশে সমাজ-বৈষম্য এতদূর প্রবল ও জাতিগত মানমর্য্যাদা হেতু পারিবারিক অবস্থা এতদূর শোচনীয়, তথায় অন্তবিধ মঙ্গলের আশা কতদূর করা যাইতে পারে! রামপুর নিবাসী কুলীন মহাশয়েরা বহুবিবাহে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজনীতি কলুষিত হইবার পক্ষে ইহাঁরা অনেক সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে আজ পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষের কৃতকীর্ত্তি রক্ষা করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। ইহাঁদের মধ্যে উদয়চাঁদ ঘোষ নামক একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক বাস করিতেন, ইনি একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। ধর্ম্মেতে ইহাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল, সাধুতা ও নিষ্ঠাকে সর্ব্বদা সমাদরের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু যে কারণেই হউক, পিতার অনুষ্ঠিত কার্য্য লোপ পাওয়া অন্যায় বোধেই হউক, বা বালিকা বিশেষের রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াই হউক, অথবা অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াই হউক, ইনি দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের এক পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের এক পুত্র ও এক কন্যা। শেষ দশায় পীড়িত হইয়া পরিবার প্রতিপালন ও ঔষধাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত প্রায় সমস্ত অর্থই নিঃশেষ হইয়া

গেল। অবশেষে যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া যথা সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীরও মৃত্যু হইল। এতদুভয়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিতে সঞ্চিত অর্থের যাহা কিছু ছিল, তাহাও ব্যয় হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদয়-ভূষণ ভূসম্পত্তির আয় দ্বারা সংসারের অভাব দূর করিতে সক্ষম হইলেন। সময়ে কিঞ্চিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিলেন। তিনি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার বিবাহে কুল রক্ষা হইবে, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তির আশা ছিল না। নিজের বিবাহে যেমন কিছু ব্যয় করিতে হইল, তৃতীয় পক্ষের বিবাহাকাঙ্ক্ষী এক সু-প্রবীণ প্রৌঢ়ের সহিত তেমনি বৈমাত্রেয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাহার দ্বিগুণ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সহজ কথায়, যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, সুদ সমেত তাহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করি-লেন। আর ও সোজা করিয়া বলিতে হইলে, এই বলিতে হয় যে, ভগিনীটির বিবাহ দিয়া তাঁহার সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হইল। তাঁহার বিমাতা গৃহিণী হইয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু টাকা কড়ি সম্বন্ধে ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত ; অর্থের ব্যাপারটা সমস্ত তাঁহার নিজের হাতে ছিল। সময়ে তাঁহার এক কন্যা সন্তান হইল। কন্যাটির শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সে শিশু মাতৃহীন হইল। বালিকা তাহার ঠাকুর মায়ের হাতে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিপদ বিপদের অনুসরণ করে ; উদয়চাঁদ ঘোষ মহাশয়ের এক-মাত্র কন্যা মনোরমা—নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অপরিচিত ও অধিক বয়স্ক স্বামীর মৃত্যুতে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে—

জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ও চক্ষের জলে ভাসিতে জীবিত রহিল। এখনও সে হতভাগিনী জানে না, তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার কোমল মুখে সরলতা ও বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতা আজিও বিদ্যমান, তাহার আশাপাখী কুটিল সংসারের কুমন্ত্রণা-জালে পড়িয়া অসময়ে মরিল। বেচারা জানিতে পারিল না যে, তাহার আশা-সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বেই অস্তগত হইয়াছে! কে বলিল ন্যায়বান ঈশ্বর এই নিরপরাধিনী বালিকাকে চিরদুঃখানলে নিক্ষেপ করিলেন? মানুষ! তুমি নিজে নানাপ্রকার অসদনুষ্ঠান করিবে, আর সেই সকল কুকার্য্যকে ধর্ম্মের নামে—ঈশ্বরের নামে প্রচার করিয়া অন্ধ মানুষকে চির অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবে! এই কি তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম, এই কি তোমার মনুষ্যত্ব!! যাহা হউক, একটি বিষয়ে সাবধান হও, এক ত মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য সকল করিতেছ—যাহা কর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহা নিবারণ করিতে অতি অল্প লোকই আছে; তবে সেই সকল অনুষ্ঠিত অন্যায় কার্য্যের পক্ষসমর্থনের সময়ে ন্যায়বান ও পবিত্র ঈশ্বরকে তোমার সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে তোমার মনের মত পাপরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া জন-সমাজকে ঘোর ভ্রান্তির পথে নিক্ষেপ করিও না। সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর। এমন পাপ ভ্রমেও করিও না।

মনোরমা বিধবা হইয়াই জননী ও ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পিতৃ-ভবনে আনীত হইলেন এবং সেই অবধি তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয়ভূষণ নিকটস্থ কোন

গ্রামের কোন মধ্যবিৎ পরিবারের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে ভগ্নসংসারকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ বিনয়ভূষণ ঐ গ্রামের মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে, মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করাই ভাল। অল্প কয়েক দিন পরে বিনয়ভূষণ মাতুলালয়ে গেলেন এবং তথায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অধ্যয়নের পর প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল, বিনয়ভূষণ যত্-দূর সম্ভব শ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে বিনয়ভূষণ অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সহিত কৃষ্ণনগর পরীক্ষা দিতে গেলেন। তথায় কয়েকদিনের অত্যধিক পরিশ্রম ও ক্লেশে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ভূষণ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গীরা সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

দুখানি ছবি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘোর পরীক্ষা।

বসন্ত সমাগমে নিদ্রিত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে—মৃত-প্রায় বৃক্ষশাখা সকলে নূতন মুকুল দেখা দিয়াছে, নূতন ফল ফুলে তরুলতা অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতিদেবীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে—দেখিলেই বোধ হয়, পৃথিবী যেন বহুকালের আলস্য ও জড়তার আবরণ উন্মোচন করিয়া এক নূতন জীবনের রাজ্যে পদার্পণ করিতেছে! জরাজীর্ণ দেহ লইয়া যে বৃদ্ধ শীতের ভীষণ আক্রমণে লোকলীলা সম্বরণ করা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় জানিয়াছিল, সে ব্যক্তিও যেন নূতন উৎসাহ ও উদ্যমে উৎফুল্ল হইয়া বিচরণ করিতেছে—সুস্থকায় ও সবলদেহ নরনারী সুমন্দ মলয়ানিল সেবনে মুখের কান্তি ও মনের প্রফুল্লতার পরিচয় দিতেছে। চারিদিকে নেত্রপাত করিলে বেশ বুঝা যায়, প্রকৃতি হাসির তরঙ্গ তুলিয়া পৃথিবীর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে—পৃথিবী আনন্দে আটখানা হইয়া প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছে—এমন সুন্দর—এমন মধুময় যে, কবির কল্পনা-রাজ্য অতিক্রম করিয়া মূর্খের নীরস হৃদয়েও আনন্দ-লহরী তুলিতেছে—নীরস হৃদয়কে হাসাইতেছে—নাচাইতেছে।

এমন দিনে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক বগুলা ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুবককে দেখিলেই বোধ হয়, বেশ ভাল মানুষ—সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন—উৎসাহ ও উদ্যম মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে—আশা ও আকাঙ্ক্ষা যুবকের প্রাণমনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—নিরাশার ছায়াও কখন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। পাঠক বোধ হয় যুবককে চিনিতে পারেন নাই—চিনিবার কোন উপায়ও নাই—যুবককে চিনিতে পারিবার কোন সন্ধানও এখন বলিয়া দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্বে যেসকল লোকের নাম করা হইয়াছে,তাহাদের কাহারও রূপের পরিচয় দেওয়া হয় নাই,—নাকটি টিকল—চক্ষু দুটি বেশ টানা—পটলচেরা—কপাল খানি একটু উঁচু বটে, কিন্তু বেশ প্রশস্ত—মুখে হাসি লাগিয়া আছে—অধর ওষ্ঠ পাতলা ও টুকটুকে লাল, মোটের উপর মুখ খানি যেন পূর্ণিমার চাঁদ—এমন করিয়া পরিচয় না দিলে কি একজন লোককে দেখিবামাত্র চেনা যায়?

একজনের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৌশল সকল সুনিপুণ চিত্রকর সূক্ষ্ম তুলিকাদ্বারা অঙ্কিত না করিলে কেহ সন্তুষ্ট হইবেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। বাহ্য সৌন্দর্য্যের আশু মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত করা সুনিপুণ চিত্রকরের কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মানবজীবনের আর একটা রাজ্য পড়িয়া আছে, আমাদের মনের ইচ্ছা, পাঠককে একবার ঐ দিকে লইয়া যাই, যে দিকের গভীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কত লোক সংসারকে অসার বলিয়া অনুভব করিতেছে—সংসারের মান সম্ভ্রম, ধন ঐশ্বর্য্য, পদ

মর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া আত্মার রাজ্যে, অনন্ত শোভার রাজ্যে ডুবিতেছে—এমন ডুবিতেছে যে, তাহাদের কাহাকেও আর সংসারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যুবক বেলাবসানে কৃষ্ণনগর উপস্থিত হইয়া একখানি বাড়ীর দ্বারে করাঘাত করিতেছেন ও নাম ধরিয়া কাহাকেও ডাকিতেছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষা করার পর একটি অষ্টম বর্ষীয় বালক আসিয়া দ্বার খুলিল, দ্বার খুলিয়া দিয়া বালক হাসি মুখে গৃহাভিমুখে ছুটিল। গৃহকর্ত্তা তাহার সহাস্য বদন ও দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, ব্যাপারটা কি?" প্রবোধ বলিল "বাবা, বিনয় দাদা আসিয়াছেন।" গোপাল বাবু বলিলেন, "তোমার বিনয় দাদা আসিয়াছেন তাই এত হাসি? তা বেশ, তুমি বিনয়কে এত ভালবাস!" এই বলিয়া পিতা স্নেহভরে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং আদর করিয়া মুখে চুম্বন দিলেন। বালক নাচিতে নাচিতে বাড়ীর অপরাপর সকলকে সংবাদ দিতে গেল যে, বিনয় দাদা আসিয়াছেন। বিনয়ভূষণ কোথা হইতে কিরূপ অবস্থায় এখানে আসিলেন, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া পরে গৃহকর্ত্তার গৃহের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল বাবু তাঁহার গৃহের সকলের কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে পর বিনয়ভূষণ বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রবোধচন্দ্র দুই তিন বার আসিয়া বিনয়ভূষণকে হাত মুখ ধুইতে অনুরোধ করিয়াছে, দুই তিনবার বলিয়াছে, "আমার মা আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, আপনি আসুন।" বালকের বিরাম নাই, একবার বাহির বাটীতে আসিতেছে, আর বার গৃহের ভিতর

মায়ের নিকট যাইতেছে। বিনয়ভূষণ হাতমুখ ধুইয়া বালকের সঙ্গে গোপাল বাবুর গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বিনয়ভূষণ গৃহিণীকে জননী-সদৃশা ভাবিতেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, গৃহিণী সাদর সম্ভাষণে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমাকে যে আর দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। সে দিন প্রবোধ বল্‌ছিল যে, তুমি নাকি একজামিনে পাস হয়েছ, তা এই কৃষ্ণনগরে থেকে কি কলেজে পড়্‌বে বলে এলে?" বিনয়ভূষণ একটু সলজ্জ ভাবে বলিলেন "এইরূপ মনে করিয়া আসিয়াছি, তবে কতদূর কাজে হবে জানি না। আমি গরিব লোক, ক্ষমতা নাই, যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া পড়া শুনা করি, তবে যে দশ টাকা স্কলারসিপ পাব, তাইতে এক রকম ক'রে চালাইতে হইবে। আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, আমার মা সেই জন্য আপনাদিগকে কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আপনারা আমার পরম বন্ধু,—পিতা মাতার কার্য্য করিয়াছেন। আমি চিরদিন তাহা স্মরণ রাখিব—কখনও ভুলিব না।" গৃহিণী বলিলেন "বাবা, পথে অনেক কষ্ট হয়েছে, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাওগে, তা না হ'লে আবার অসুখ হবে। বিদেশে সর্ব্বদা বেশ সাবধানে থাকিবে।" বিনয়ভূষণ আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

কলেজ খুলিয়াছে। বিনয়ভূষণ কলেজে প্রবেশ করিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে অধ্যাপকদের বড় ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিলেন, সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে তারাপ্রসাদ বাবু নামে একজন

বিনয়ভূষণকে বাস্তবিকই "বিনয়ভূষণ" বলিয়া মনে করিতেন। তারাপ্রসাদ বাবু নিজে একজন সচ্চরিত্র ও সাধু পুরুষ। স্থানীয় আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার সরল মুখে সুন্দর স্বর্গীয় জ্যোতি ও মধুর হাসি অনুক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কখন তাঁহার বিষণ্ণ মুখ বা বিরক্তির ভাব দেখে নাই। যিনি একটি বারও তাঁহার সহিত আলাপ করেন তিনি আর কখন তাঁহার সদ্ব্যবহার ও মিষ্ট কথা ভুলিতে পারেন না। ইনি নিজের চরিত্র-গুণে সকলেরই অতি শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। বিনয়ভূষণ যেমন একদিকে অবিশ্রান্ত শ্রমসহকারে বিদ্যালাভে যত্নবান আছেন—অপরদিকে আবার সেইরূপ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের সচ্চরিত্র ও সাধুভাবের অনুকরণ করিতেছেন। বিনয়ভূষণ এই-রূপ মনোযোগসহকারে যখন আত্মোন্নতি সাধনে যত্নতৎপর, তখন তাঁহার বাড়ী হইতে একখানি পত্র আসিল। পত্রের মর্ম্ম এই :—আগামী গ্রীষ্মের অবকাশে তুমি গৃহে আসিবে। মাতা-ঠাকুরাণীর আদেশক্রমে তোমাকে লিখিতেছি যে, আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমার শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিনয়-ভূষণ পত্র পাঠে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সংজ্ঞাহীনের ন্যায়—বিচেতনপ্রায় বসিয়া রহিলেন। মনের আঁধার কুটিরে কে যেন চুপে চুপে দেখা দিতেছে—কে—ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না—কত চিন্তাই তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল!—কাহারও হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিলেন, কিন্তু লোক চিনিলেন না! এক একবার

চিন্তার তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রায়াস পান, আবার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিতে না পারিয়া—আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া থাকেন। এইরূপ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইল। সে দিন আহার করিলেন না, কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। বন্ধু বান্ধবেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার মনের কথা সে দিন জানিতে পারিলেন না। রাত্রি অনেক হইল—সকলেই নিদ্রিত—কেবল বিনয়ভূষণ একা জাগিয়া আছেন। অনেকক্ষণ শয্যার উপর মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারেন না—তাঁহার বোধ হইল যেন সমস্ত শরীর জ্বলিতেছে—আর শয্যা সেই গাত্রদাহকে দ্বিগুণতর করিয়া তুলিয়াছে। বিনয়ভূষণ একাকী ছাদের উপর উঠিলেন। গভীর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত—নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ঘন আঁধারে ক্রীড়া করিতেছে—কে যেন লুকাইয়াছে, তাই চুপে চুপে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—যাহাকে খুঁজিতেছে তাহাকে না পাইয়া কল্পিত ক্রোধভরে সকলকেই অল্পাধিক আঘাত করিতেছে। বিনয়ভূষণ এই স্নিগ্ধ বায়ুর মৃদু হিল্লোলে একটু শান্তি অনুভব করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার যে আগুন সেই আগুন সর্ব্ব শরীরকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ছেলে মানুষ তাতে পঠদ্দশা—মা ও বড় ভাই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন—এতে এত গায়ের জ্বালা কেন? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে। যাহার লক্ষ্য ঠিক নাই—জীবনের উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি বুঝে না—যাহার আকাঙ্ক্ষা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে

নাই—যাহার আশা অল্পদূর যাইতে না যাইতে অস্থিরতার ঘন কুজ্ঝটিকার ভিতরে লুকাইয়া যায়—আর দেখা যায় না, তেমন ব্যক্তিই নীরবে আপনাকে অন্যের করে অর্পণ করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি জীবন-গতি নির্ণয় করিয়াছে—যাহার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য-বস্তু লক্ষ্য করিয়াছে—যাহার আশা জীবনের উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতে শিখিয়াছে, সে কি করিয়া আত্মবিক্রয় করিবে? যে যুবক ভবিষ্যতে মনুষ্যত্ব লাভ করিবে বলিয়া—দুরারোহ জীবন-বৃক্ষে আরোহণ করিবে বলিয়া, পথ পরিষ্কার করিতেছে, তুমি কোন্ প্রাণে তাহার সেই বৃক্ষে উঠিবার পুর্ব্বেই, বৃক্ষের স্কন্ধদেশে কণ্টক লাগাইয়া দিতে চাও? তুমি আত্মীয়?—তুমি স্বার্থান্ধ পরম শত্রু; হয়ত সময় এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিবে। যখন জননী-ক্রোড় নবকুমারে সুশোভিত হয়, তখন তিনি স্নেহাস্পদ ও প্রিয়তম তনয়ের কোমল মুখে নূতন মধুর হাসি দেখিয়া নিজ হৃদয়-সরোবর কি অপূর্ব্ব আনন্দবারিতে পূর্ণ দেখেন! আর সেই সঙ্গে প্রাণসম পুত্রের ভাবী জীবনের প্রত্যেক দিনে এইরূপ নবোন্নতি দেখিতে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়। সেই সকল অভিলষিত উন্নতির দিন আসিবার পূর্ব্বেই সময়স্রোতঃ যদি সে জীবনকে বিপরীত পথে চালিত করে, তবে কি শুভাকাঙ্ক্ষিনী জননীর আশাপূর্ণ হৃদয় নিরাশার গভীর জলে ডুবিয়া যায় না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা।

বিনয়ভূষণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। তাঁহার চিরজীবনের একটি সঙ্গিনী—তাঁহার সুখ দুঃখের সমান অংশ গ্রহণ করিতে—সম্পদে বিপদে তাঁহার সহচারিণী হইতে চলিল। তখন তিনি ভাবিলেন ও নিজে নিজে বলিতে লাগিলেনঃ—যে আমার হবে—যাকে আপনার বলিয়া চিরকাল আদর করিতে হইবে, সে আমার হবে কি না—সে আমার প্রদত্ত আদরের উপযুক্ত কি না, একবার তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিতে—একবার সে কল্পনাময়ী অপরিচিতা কুমারীকে দেখিতে পাইব না; অথচ তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! মানুষের আগে পরিচয়, কি আগে পরিণয়, আমি এখনও সেটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেই নৈশ বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া বিনয়ভূষণ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—মনের দুঃখে আবার বলিতে লাগিলেনঃ—উঃ কি কঠিন সমস্যা! আমার পক্ষে এখনি কি এই সকল চিন্তা করিবার সময়? আমি কোথায় স্থিরভাবে, শান্তমনে লেখা পড়া শিখিব—মানুষ হইব, তা না করিয়া, আমি এই গভীর রাত্রের ঘন অন্ধকারে একাকী ছাতের উপর বসিয়া আমার বিবাহ ও তন্নিবন্ধন সুখ দুঃখের পারমাণ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া স্থির

করিতেছি! আমার মা নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক, দাদা মহাশয় কোন প্রকারে মাকে বুঝাইয়া, এই কার্য্যটি সম্পন্ন করাইবার চেষ্টায় আছেন। দাদা যেরূপ চতুর লোক, আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, এমন উপায় অবলম্বন করিবেন, যে অবশেষে বিবাহ করিতে বাধ্য হইব।

এই কথাটি শেষ হইতে না হইতে বিনয়ভূষণ দেখিলেন যেন ছাতের অপরপ্রান্তে কে একজন চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সহসা এরূপ মনে হওয়াতে একটু ভয় হইল। ভাবিলেন, এত রাত্রে কে কোথা হইতে আসিয়া ছাতে বসিল, আর কেনই বা আসিল? আর যদি আমার কোন কথা শুনিয়া থাকে, তবে ত বড় অন্যায় হইবে। আমার প্রাণের কথা আমারই প্রাণের ভিতর থাকিবে, অপরে শুনিবে কেন? পলক মধ্যে সেই মনুষ্যমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক পা, এক পা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি,—কে—বলনা—"। "অপরে শুনিবে কেন? অপরে শুনিলে তুমি ফাঁসে যাইবে, না?" বিনয়ভূষণ বলিলেন, "কে—শরৎ? তুমি এখানে কেন?" শরৎ বলিলেন, "কে বিনয়? আমি যে কেন এখানে, তাত তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আমি সন্ধ্যাবেলা অনেক চেষ্টা করিয়াও তোমার মনোমালিন্যের কারণ জানিতে না পারিয়া, বড়ই উৎকণ্ঠিত হই, ঘুম আর হয় না, ভাবিলাম ছাতে যাই—ছাতে আসিয়া দেখি, তুমি এই অন্ধকারকে আলো করিয়া বসিয়া আছ। তারপর যাহা হইয়াছে, তুমিও জান, আমিও জানি।" বিনয়ভূষণ বলিলেন

"দেখ শরৎ! আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমার জীবনে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত—বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছে। দাদা আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবেন, এই আশায় আমাকে অসময়ে বিবাহজালে জড়াইতেছেন। অর্থ-লাভ ভিন্ন অন্য লক্ষ্য থাকিলে, কখনই আমার এরূপ শিক্ষালাভের সময়ে, জীবনের পথে এত বাধা বিঘ্ন আনিয়া দিতেন না।

শরৎ বলিলেন,"তুমি কেন এমন মনে করিতেছ? তোমার দাদা তোমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়াও ত এরূপ কাজ করিতে পারেন। মনে কর তিনি এমন ভাবিতে পারেন, ভাইটি বিদেশে থাকে—সে তরুণবয়স্ক যুবক—নানাপ্রকার প্রলোভনের স্রোতঃ চারি দিকে প্রবাহিত—এমন অবস্থায় তাহাকে পরি-ণয়পাশে বদ্ধ করিতে পারিলে, তাহার ভাবী কল্যাণ সাধিত হইবে, এমনও ত ভাবিতে পারেন।"

তদুত্তরে বিনয়ভূষণ বলিলেন,"মানুষকে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মশীল করিবার এই বুঝি সদুপায়। বেশ! এ যুক্তি মন্দ নয়। একটি ধর্ম্মকথা বলা নাই—একটা সদুপদেশ দেওয়া নাই—মানুষ করিবার জন্য তেমন আগ্রহ নাই—তবে বিবাহ দিয়া তাহাকে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করা হইবে, না তাহার সর্ব্বনাশ করা হইবে? বিবাহটা কি এমন নিকৃষ্ট কাজ যে, মানুষকে মন্দ কার্য্য হইতে—পাপ হইতে রক্ষা করিবার উপায় মাত্র! ছি! আমি এমন যুক্তি শুনিতে চাই না। দুই ব্যক্তির মিলনসাধনের নামই বিবাহ—একজন আর একজনের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবে—নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আর একজনকে

ডুবাইবে—ইহারই নাম বিবাহ। বিবাহ, পাপ ও মলিনতা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে, এ কথা বলিলে বিবাহ বস্তুটাকে অতি হীনভাবে দেখা হয়। বিবাহ আত্মাকে উন্নত করিবে—পুণ্যের পথে—পবিত্রতার পথে—আত্মার উন্নতির পথে, ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ পতিপত্নীর জীবনের পথে—বিবাহ, পরম সহায়। তুমি কি ইহা বুঝ না?"

শরৎ বলিলেন, "হাঁ আমি খুব বুঝি, কিন্তু আমি ত আর আমার নিজের কথা বলি নাই। আমাদের সমাজের লোক, যে ভাব দ্বারা চালিত হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র সন্তানদের বিবাহ দেন, আমি তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি। তাহারা বাস্তবিকই মনে করেন যে তাঁহাদের সন্তানদের অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে, সন্তানেরা কুপথগামী হইবে।"

বিনয় বলিলেন, "অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া—অল্প বয়সে সন্তানের পিতা হইয়া—উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থতানিবন্ধন, যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরী করিতে বাধ্য হইয়াথাকে, সে বুঝি আর কুপথগামী হওয়া নয়?"

শরৎ বলিলেন,"সেগুলিকে হয়ত তত বড় পাপের কাজ বলিয়া মনে করে না, তাহার প্রমাণ এই যে, এ দেশে উৎকোচ গ্রহণটাও উপার্জ্জনের সামিল। আমি শুনিয়াছি, অনেক প্রবীণ লোকে বলিয়া থাকেন, '৫০ টাকা বেতনের উপর আর কিছু উপ্‌রি পাওনা টাওনা আছে ত?' দেখত কি ভয়ানক!

বিনয় বলিলেন, "তবে আর তাহাকে পাপ হইতে—অসৎ পথ হইতে রক্ষা করা হইল কই? একটা, না হয় আর একটা পাপে, সে ডুবিল ত?"

শরৎ বলিলেন "আমি তোমাকে ইহার কুফল সুফল দেখাইতেছি না; ইহা অন্যায়, কি ন্যায়, তাহাও বলিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র বলি, যে তোমার দাদা সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এ কথা কেন তুমি অস্বীকার কর?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে, এক পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সুপ্রবীণ বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন? হতভাগিনী বালিকাকে অসময়ে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য,তাহার জীবনপথকে গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিবার জন্য, এই সুমহৎ সাধু ইচ্ছার অধীন হইয়া, এই কাজটি করিয়াছিলেন, কেমন না? ঐ যে টাকাগুলি বৃদ্ধ দিয়াছিল, তাহারই মধুময় প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, একটা বালিকার মঙ্গলামঙ্গল একবারে ভুলিয়াছিলেন। যতই আমার জ্ঞানোদয় হইতেছে, আমি ততই বুঝিতেছি, তাহার মলিন মুখের বিষাদরাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া আমার প্রাণের শান্তি-সূর্য্যকে ঢাকিতেছে। ভাই! তুমি সদিচ্ছার কথা বলিও না। এ সময়ে আমার বিবাহ হইলে, আমার জীবনটা আরও অশান্তিময় হইয়া পড়িবে।

শরৎ এই বলিয়া পরামর্শ দিলেন যে, তবে তুমি তোমার দাদাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দাও, যে তুমি এখন বিবাহ করিবে না। তিনি যেন এখন বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া তোমাকে অস্থির করিয়া না তুলেন।

বিনয় বলিলেন "মা যে ক্লেশ পাইবেন, সেই ভয়ই বড় ভয়।

আমি প্রাণান্তেও তাঁহাকে ক্লেশ দিব না—অসন্তুষ্ট করিব না। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে, যদি আমি মরি, তাহাও আমার ভাল।”

শরৎ মিষ্ট ভাবে আবার বলিলেন “তবে একবার বাড়ী যাও, মায়ের সঙ্গে দেখা কর। বিবাহ করিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে, তাঁকে বুঝাইয়া বল। তোমার অভিপ্রায় তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, তিনি তোমার উদ্দেশ্যের পথে অন্তরায় হইবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

কি শুভক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ঐ সজীব ভাষার ভিতর, কি এক মহামন্ত্র লুক্কাইত আছে—পড়িতে পড়িতে মৃতপ্রায় মানুষ জীবন লাভ করে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নব বেশে জনসমাজে বিচরণ করে—সমাজ শাসনে যে দেশের লোক ব্যক্তিত্ব—স্বাধীন ভাব হারাইয়া, সকল বিষয়ে, ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির পদলেহন করিতেছে—সময় স্রোতঃ যে দিকে ইচ্ছা, লইয়া যাইতেছে—কথা নাই—বার্ত্তা নাই—আপত্তি নাই—অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে করিতে, কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—ইহারা জানে না, কোথায় যাই-তেছে—আর কোথায় যাইতে হইবে। যখন এমন ভাবে

মানবজীবন অতিবাহিত হয়, তখন মানবজীবনে ও পশু-জীবনে প্রভেদ কোথায়, পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ। এইরূপ জাতীয় অবনতির দিনে—ব্যক্তিগত জীবনের শোচনীয় দুর্দ্দশার দিনে, কাহাকেও মনুষ্যত্বের পথে—স্বাধীনতার রাজ্যে—নিজের দুই খানি পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে দেখিলে, প্রাণ আপনা হইতে নাচিয়া উঠে—এক জনকে মানুষের মত হইতে দেখিলে, কেনই বা না হৃদয় মন আনন্দে পূর্ণ হইবে? এদেশের কুসংস্কারের গভীর ঘন অন্ধকার, ইংরাজী শিক্ষার তীব্রালোকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদূরিত হইতেছে, বিনয়ভূষণের হৃদয়প্রান্তে লুক্কাইত চিন্তা-কণাই তাহার প্রমাণ—ঐ যে মানুষ হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা—ঐ যে অসময়ে সংসার-জালে জড়িত হইয়া পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থতার জন্য হাহাকার করিয়া মরিতে অনিচ্ছা—ঐ যে অপরিচিতা বালিকাকে আপনার চিরদিনের সঙ্গিনী করিতে প্রবৃত্তির অভাব, এ সকলই ঐ ইংরাজী ভাষার জীবন্ত প্রভাবে ঘটিয়াছে।

বিনয়ভূষণ কয়েক দিন অতি ক্লেশে যাপন করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে গৃহে গমন করিলেন। পথে কোথাও নৌকা—কোথাও গোযান—কোথাও বা পদব্রজে যাইতে হইতেছে। চিন্তার বিশ্রাম নাই—কত রকমের চিন্তা উদয় হইয়া তাঁহাকে কত ভাবের পথে লইয়া চলিয়াছে—কত ছাই পাঁশ, মাথা মুণ্ড চিন্তা করিলেন, তাহার ঠিক নাই—কত সাধু চিন্তা—কত পাপ চিন্তা—কত মলিন ভাবনা, তাঁহার কল্পনাকাশে উদয় হইল এবং এইরূপে কুভাব সুভাবের তরঙ্গে পড়িয়া একবার পড়িতেছেন একবার উঠিতেছেন, এমন ভাবে পথে চলিয়াছেন

—সহসা তাঁহার মনে হইল—ভগবানের রাজ্যে, স্বাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—বুদ্ধি বৃত্তি ও যুক্তি দ্বারা বিষয় বিশেষের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে অধিকারী হইয়া, নিজ স্বাধীনতাকে—প্রাপ্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানকে পদদলিত করিব—দেশ বা সমাজ বিশেষের অবলম্বিত প্রথা সকলকে বিনা যুক্তি ও বিনা বিচারে গ্রহণ করিব এ কেমন কথা?—আমি যাহা বুঝি না, তাহা পালন করিতে হইবে—আর যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি—যাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে, প্রাণে আরাম পাই, তাহাই উপেক্ষা করিব? তবে আমার মনুষ্যত্ব কোথায়? যখন দেখিব সকল লোক এইরূপ ভ্রান্তির পথে যাইতেছে, তখন বুঝিব মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে—মানুষ স্বাধীন চিন্তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে—তখন বুঝিব মানুষের আবার উঠিয়া দাঁড়াইবার আশা চিরদিনের তরে অস্তগত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতেছি, চেষ্টা করিলে, মানুষ হওয়া যায়—স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারা যায়—নিজে যাহা বুঝি, সেইমত কার্য্য করিবার শক্তি ভগবান আমাকে দিয়াছেন—দশ জন যখন কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিতে পারিতেছে, তখন আমি কেন পারিব না? আমি যাহা বুঝি ঠিক তাহাই করিব। যদি কেহ বলেন, আমি ব্যক্তি বিশেষের বা লোকসমাজের অবমাননাকারী—বহুকালের প্রতিষ্ঠিত ও বিশেষ চিন্তা দ্বারা গঠিত প্রথা সকলের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছি, তাহাতে দুঃখিত হইব না, যদি বুঝিতে পারি যে আমার বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা মীমাংসিত সত্য সকলের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেছি। লোকের নিন্দা ভাজন ও বিরাগের কারণ হইতে তত কাতর নহি—নিজের

স্বাধীন ইচ্ছাকে ইহার স্বাভাবিক পথে চলিতে না দেখিলে, যত কাতর হই ও মর্ম্মবেদনা পাই। এদেশে এরূপ সংস্কার আছে, যে অষ্টমে কন্যা দান করিলে, গৌরী দানের ফল হয়—নবমে পৃথিবী দানেব ফল হয়—দশমে কন্যা দানেব ফল মাত্র হয়, তদূর্দ্ধে কন্যা দান নিষিদ্ধ কার্য্য। এ সংস্কার ভাল কি মন্দ বুঝি না—কেন যে সমাজ মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হইল, তাহাও জানি না। তবে পরিণয় বলিলে যাহা বুঝায়—ধর্ম্মপত্নী বলিলে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, সেটি বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলে, সে মহাব্রত পালনের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয় না। শশ্মানবাসী বৈরাগী কৈলাসপতি যে সতীশোকে পাগল হইয়া, তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি কি সেই পাগলের সমগ্র হৃদয় মন অধিকার করেন নাই? যিনি পতির মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিয়াছিলেন ও অটল পতিভক্তি ও অক্ষয় প্রেমের প্রভাবে মৃত পতিব প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন; এই ঘটনা ত সেই সতীর অবিচলিত প্রেমানুরাগের পরিচয় দিতেছে। জানকীকে বনবাসে দিয়া মহামতি রামচন্দ্র সমগ্র ধরা শূন্য ও আঁধার দেখিয়াছিলেন, সেই অন্ধকারের ভিতর কি সমস্ত হৃদয় বিক্রয়ের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না? এরূপ দম্পতীর সম্মিলিত জীবনস্রোতঃ কি সুন্দর—কি মধুময়! কেহ হয়ত বলিবেন, হরের গৌরী, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী, রামের সীতা ত আর সকলের ভাগ্যে ঘটে না—কণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথে, দুরারোহ ধর্ম্মপথে, এরূপ উচ্চ চরিত্রের

পতি ও পত্নী লাভ প্রার্থনীয় হইলেও সকলে কোথায় পাইবে? আমি বলি, কেন ঐ আদর্শে নিজের নিজের ছেলে মেয়ে গুলিকে মানুষ করিতে চেষ্টা করিলেইত হয়। যদি বিবাহের কোন অর্থ থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত দম্পতীগণের জীবনতত্ত্ব কি তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে না? ঐ সকল ভারতমহিলা-গণের জীবন, সত্য সত্যই তাঁহাদের ভর্ত্তাদের মঙ্গল সাধনে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। চরিত্র ও কার্য্যগুণে ইহাঁরা বাস্তবিকই সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিয়াছিলেন। সত্যকথা বলিতে গেলে, এই বলিতে হয়, আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলে, লোক এই উত্তর দিতে বাধ্য বলিয়া বোধ হয়, মানব-মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলে, এই একই উত্তর পাওয়া যায় যে, যদি জগতে কাহাকেও প্রকৃত বন্ধু বলিতে হয়, যদি কেহ বন্ধুপদ বাচ্য হন, যদি কেহ সুখে ও দুঃখে সমাংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে ধর্ম্মপত্নীই সেই আখ্যা প্রাপ্ত হইবার উপ-যুক্ত পাত্রী। যিনি সুখের সময়ে আনন্দ বর্দ্ধন করেন, দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা-বারি সেচন করেন, যিনি সম্পদে সুযোগ্য মন্ত্রী, বিপদে বল ও বুদ্ধি, যিনি সুস্থতায় দীর্ঘায়ুর কারণ ও রোগ-শয্যাতে প্রধান পরিচারিকা, যিনি ধর্ম্মপথে প্রধান সহায়—চির-জীবনের জন্য ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, সকল অবস্থার সমান অংশ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বল, স্ত্রী বল, বা বন্ধু বল, যাহা ইচ্ছা বল। আমি ত এই সম্বন্ধের ভিতর মানবজীবনের এক অনন্ত সুখের অথবা অনন্ত দুঃখের সূত্রপাত দেখিতে পাই, এক্ষণে কথা এই যে, এমন কঠিন বন্ধনে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, আমি কেন তাহার সহিত পরিচিত হইতে পাইব

না? বিবাহে সুখ ও শান্তি, পরিণয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মিলে, তাহার সুবাতাসে বাস করিতে অনেকে সম্মত হইবেন, কিন্তু দাম্পত্যবন্ধন প্রেমের পরিবর্ত্তে যদি হলাহল উৎপাদন করে—উভয়কে যদি মর্ম্মবেদনার আগুণে দগ্ধ করে, তবে কে সে জীবনাবধি প্রজ্জ্বলিত অশান্তি-বহ্নিতে ভস্মিভূত হয়? যে দুই হতভাগ্য ব্যক্তি সেই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ, তাহারাই পতঙ্গের ন্যায় সেই অনলে পুড়িতে থাকে। যদি সুখের সময়ে ও দুঃখের সময়ে সাক্ষাৎ ভাবে পতিপত্নীই ফলভোগ করেন, তবে তাঁহারা না বুঝিয়া কেন এমন কাজ করিবেন? সামান্য একটা কাজে কেহ প্রতারিত হইলে, লোক কথায় বলে, "যেমন না বুঝে কাজ কর্‌তে গিছ্‌লে তেমনি ফল হয়েছে।" বাহিরের লোকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে গেলে—সামান্য একটা কার্য্য কাহারও সহিত মিলিত হইয়া করিতে গেলে, লোকে তাহাদের বিষয় কত অনুসন্ধান করে। সকল কাজের সময়ে "আট ঘাট বাঁধা বন্দোবস্ত", কেবল বিবাহটা এমনই ছেলেখেলা, যে যাহারা বিবাহ করিতেছে, তাহারা তাহার দায়িত্ব বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, বিবাহ দিয়া দিবে! অষ্টম বা নবমবর্ষে বালিকার এমন কোন জ্ঞানেরই বিকাশ হইতে পারে না, যদ্দ্বারা সে তাহার ভাবী জীবনের গভীর দায়িত্বের পরিমাণ অনুভব করিতে সক্ষম হয়। যাহার দায়িত্ব সে তাহা নিজ-হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বেই, অন্য কর্ত্তৃক তাহার মস্তকে দায়িত্ব-ভার নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা, জন সমাজের উন্নতির মূলে—সত্যের বিস্তৃতির মূলে—ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার মূলে—বিবেকের প্রদীপ্তাবস্থা রক্ষাকরণের মূলে, আর কি গুরুতর

আঘাত করা যাইতে পারে? এমন কি, এ আঘাত জন-সমাজকে এত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে, যে কাল স্রোতঃ তাহার পর বহু কালের জন্য প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইলেও তাহার সংশোধন হয় না। অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ হওয়ার বিষময় ফল এদেশে যেমন ফলিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি নহে—ইহার কুফলের সংখ্যা গণনাতীত। এইরূপ বিবাহের পর, পতিপত্নীর দাম্পত্যব্রত পালনের পথে—পবিত্র সংসার-ধর্ম্ম পালনের পথে, মনের অমিলনরূপ কণ্টক যদি জন্মে, তবে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। দম্পতী চিরদুঃখানলে নিমর্জ্জিত হন—অনন্ত শোকানল তাহাদের অন্তরে প্রজ্জলিত থাকে। এ দুঃখানল নির্ব্বাণ করিতে—এ শোকানলে স্নিগ্ধবারি সিঞ্চন করিতে, আজ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যুবক, এ সকল কাজকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, এত লোক এই অবিবেকী বন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিরজীবন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিলেও, চারিদিকের হাহাকার ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিলেও কি, আমি সাবধান হইব না, ঐ মৃত্যুর পথে—ঐ দুর্দ্দশার পথে, আমাকে না নিয়ে গেলেই নয়? আমি এমন কর্ম্ম কখন করিব না! কত লোক যে অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া, স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া, মাথায় হাতদিয়া ভাবিতেছে, ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া যাইতেছে, অকালমৃত্যু, বিধবা ও অনাথ বালক বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, সমাজের দুঃখ দারিদ্র্যও সেই পরিমাণে বাড়াইতেছে! তুমি তোমার অনুষ্ঠিত পাপের দুর্গন্ধ গোপন

রাখিতে, নানাপ্রকার বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে পার, কিন্তু চিরজয়ী সত্যের প্রতিভার সমক্ষে তোমার দুর্ব্বল যুক্তি ও অর্থ শূন্য তর্ক পরাভূত হইবেই হইবে। যে পরিণয় ন্যায়বান ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম লঙ্ঘন করায়—যাহার যোগ মাত্র প্রকৃতির হন্তারক—যে যোগ বাল্যযৌবনের জনয়িত্রী—শরীর ও মন উভয়কেই অকাল পক্কতা নিবন্ধন হীন ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে এবং এইরূপে সমগ্র জনসমাজকে অধোগতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, যে জনক জননী তাঁহাদের প্রিয়তম সন্তানগণের জীবনে এইরূপ বহু অনর্থকর ও নিতান্ত শোচনীয় অভিনয় সকলের মূল কারণ, তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখেন, যে তাঁহাদের এই অবিবেচনা ও কুসংস্কার তাঁহাদের সন্তানদের কত অকল্যাণের কারণ হইতেছে? আমার মাকে বুঝাইয়া বলিলে, এসকল কথা কি তিনি বুঝিবেন? তাঁহাকে দাদা যাহা বলিবেন, তিনি তাহাই বুঝিবেন। আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া মা হয়ত আমারই সর্ব্বনাশ করিবেন। আমি সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব যদি নিতান্ত না বুঝেন তবে তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব, যে আমার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি বিবাহ করিব না, ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্দী-দশা।

আজ বিনয়ভূষণের অবস্থার কথা ভাবিতেও চক্ষে জল আসে। বিনয়ভূষণ গ্রীষ্মাবকাশে গৃহে আসিয়াছেন। কোথায় এক মাস কাল মনের সুখে গৃহে জননী ও ভগিনীর সঙ্গে কাল কাটাইবেন—কোথায় শৈশবের বন্ধু বান্ধব লইয়া দুইদিন আনন্দে যাপন করিবেন—কোথায় স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিবেন, তাহা না হইয়া আজ তিনি চোরের মত বন্দী হইয়া এক নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ। তাঁহার জননীই কেবল এক একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন। যখন তিনি পুত্রের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন কেবল ঐ বিবাহের কথা, বিবাহ বিষয়ে তাঁহার পুত্রের সুমতি হইল কি না এবং কথায় কথায় তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় কিনা, দেখিবার জন্যই এক একবার আসিয়া থাকেন। বিনয়ভূষণ বন্দী-দশাতে আছেন! তাঁহার এক বাল্যবন্ধু এই কথা শুনিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইলেন। তিনি বিনয়কে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বিনয়দের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। বিনয়ের মা প্রথমতঃ দেখা করাইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু সে যুবকের কাতর বাক্যে তাঁহার প্রাণ আর্দ্র হইল, তিনি বিনয়ের ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিনয়ভূষণ তাঁহার বন্ধুকে দেখিয়া একটু প্রসন্নভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু

পরক্ষণেই আবার গভীর বিষাদের ঘন মেঘে তাঁহার সরল মুখখানি ঢাকিয়া গেল—তিনি আপনার মনের আশা ও সেই আশাপথের অন্তরায়সকল স্মরণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। বিনয়ভূষণ বন্ধুকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! ভাবিয়াছিলাম, মন প্রাণ ঢালিয়া লেখাপড়া শিখিব, উপযুক্ত রূপে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে সংসারে প্রবেশ করিব। মাকে এসকল কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, মাও বুঝিয়াছিলেন যে, আমার এখন বিবাহ না করাই ভাল, তিনি আমাকে কৃষ্ণনগর যাইবার অনুমতি দিলেন, আমি সংগোপনে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়াছি, এমন সময়ে দেখি, দাদা মহাশয় পথে আমাকে ধরিতে গিয়াছেন, বাড়ী হইতে কতদূর গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফিরিতে বলিলেন, আমি কিছুতেই আসিব না, শেষে আমাকে নানা প্রকার মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া ও আমার ছুটী শেষ হয় নাই দেখাইয়া বাড়ী আনিলেন। বাড়ী আনিয়া মাকে কাণে কাণে কি পরামর্শ দিলেন, জানি না, মায়ের দ্বারা আমাকে ঘরে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় আমি জানি, মাকেও তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছি, মা কিছুতেই বুঝিবেন না। আমার ছুটীও শেষ হইল, আমি বড় বিপদে পড়িলাম, আমার পড়া শুনার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে ভাবিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে, আমার মনে হইতেছে, আমি ছুটিয়া কৃষ্ণনগর যাই—ইচ্ছা করিলে যাইতেও পারি—কেবল মায়ের চক্ষে জলধারা দেখিতে পারিব না—কাণে শুনিতেও পারিব না, তাই মায়ের বিনানুমতিতে যাইতেছি না।" মা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মায়ের দিকে

তাকাইয়া ও মায়ের চরণ ধরিয়া বিনয়ভূষণ বলিলেন "মা! তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমাকে যাইতে বল, আমি চলিয়া যাই, আমি মানুষ হইলে, তোমরাই সুখে থাকিবে। তোমাদিগকে সুখী করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। তুমি এখনও আমার কথা শুন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার দ্বারা কোন কাজ করাইলে, পরিণামে সকলকেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।" মা সন্তানকে শান্ত করিয়া বলিলেন "বাবা বেশ ভাল মেয়ে পাওয়া গিয়েছে—ভাল ঘর—অনেক টাকা দিতেছে, যখন আমাদের অবস্থা ভাল নয়, তখন কি এমন সুযোগ ছাড়িতে আছে? বাবা! আমি তোমার দুইখানি হাতে ধরিয়া বলিতেছি আমার কথা রাখ—বিবাহ কর—বিবাহ করিয়া পরে পড়িবার জন্য চলিয়া যাও।" পুত্র বলিলেন "আমি এখন লেখা পড়া শিখিব—আমার এখন পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই, আমার বিবাহে আমার ও তোমাদের যে ক্ষতি হইবে তাহা আমি বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, তোমা-দিগকেও তাহা বলিয়াছি। আমার ঐ পাত্রীকে বিবাহ করিতে কিম্বা ঐ ঘরে বিবাহ করিতে ত কোন আপত্তি নাই। আমি কেবল উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া এত অল্প বয়সে বিবাহ করিতে সম্মত নই। এই সহজ কথাটি যদি না বুঝিতে পার, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি।

এমন সময়ে শুনা গেল, এক জন ভদ্রলোক বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া বিনয়ভূষণকে ডাকিতেছেন। বিনয়ের মা নেপালকে বলিলেন, "বাবা দেখ্‌ত বাহিরে কে ডাকে।" নেপাল বাহিরে

গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, যে কৃষ্ণনগর হইতে গোপাল-চন্দ্র সরকার ও শরৎচন্দ্র বিনয়ভূষণকে দেখিতে আসিয়াছেন। বিনয়ভূষণ শুনিবামাত্র মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে যাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়াছিলাম, তিনিই আসিয়াছেন, আমি দেখা করিতে যাই।" মা কি করিবেন, লোকলজ্জার অনুরোধে সন্তানকে তখন বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন। বিনয়ভূষণ বাহির বাটীতে গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সাদর সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে বসাইলেন। শরৎ ও গোপাল বাবুকে দেখিয়া বিনয়ভূষণের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন যদি ইঁহাদের সাহায্যে এবার গৃহ হইতে বিদায় লইতে পারি, তবে আর পঠদ্দশায় বাড়ী আসিব না, একবারে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া গৃহে আসিব। গোপাল বাবু ও শরৎচন্দ্র উভয়েই এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনয় কি ভাবিতেছ?" বিনয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। শরৎ বলিলেন বিনয় কাঁদ কেন? ভয় কি, আমরা সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াছি, তোমার ভয় কি? তোমার বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে, আমরা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। তুমি শান্ত হও। বিনয়ভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আজ কয়েকদিন যে কি ঘোর যন্ত্রণার ভিতর দিয়া আমার দিন রাত্রি কাটিতেছে, তাহা আমি জানি, আর আমার ঈশ্বর জানেন, আর কাহারও বুঝিবার নহে। বিনয়ভূষণ যতই মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া—চক্ষের জল মুছিয়া ভাল মানুষটি সাজিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাহার ক্ষোভ ও মনের অশান্তি পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিতেছে, এমন

সময় বিনয়ভূষণের দাদা গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। দুই জন অপরিচিত লোক বসিয়া আছে, আর ছোট ভাই তাহাদিগকে আত্মীয় জ্ঞানে, আপনার মনের কথা বলিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইচ্ছা হইল অতিথীদ্বয়কে তখনই বিদায় করিয়া দেন, কিন্তু লোকাচার তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, সুতরাং তিনি ভদ্র লোক দুইটিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু নেপালের দ্বারা বিনয়ভূষণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইলেন এবং অন্যায় রূপে ভৎর্সনা করিলেন। আবার পরক্ষণেই ভদ্রবেশে ও সহাস্য বদনে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে ও তাঁহাদের প্রতি সামাজিক সদ্ব্যবহার দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। বিনয়ভূষণ শরৎকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই! আমি ত এখন কিছুতেই বিবাহ করিতে চাই না। কিন্তু মা ত কিছুতেই ছাড়িবেন না। উপায় কি বল ত, আর বিবাহের কথা কেহ উপস্থিত করিতে না করিতে, আমার নির্জ্জন হৃদয়কুটীরের এক প্রান্তে একখানি সরল ও লাবণ্যপূর্ণ মুখের ছবি উদয় হয়, কিন্তু সে কে, তাহা বুঝি না। অথচ তাহার মিষ্টকথা, তাহার বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতার সহিত যৌবনের গাম্ভীর্য্যের সম্মিলন, তাহার চিত্তাকর্ষণকারিণী শক্তি ও আমার প্রতি তাহার ভালবাসা আমার মনকে অধিকার করে। ভাই! একি আমার স্বপ্ন? আমার মন এই কল্পনাময়ী প্রেম-প্রতিমার দিকে ছুটিতেছে। আমি বিবাহের চিন্তা কখনও করি নাই, বিবাহের সুখ দুঃখও

জানি না, এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছাও নাই কিন্তু বিবাহ বলিয়া একটা কিছু উপস্থিত করিলেই, সেই স্বপ্নবৎ ছবি আমার প্রাণপটে প্রতিবিম্বিত হয়।” শরৎচন্দ্র ক্ষণেক মৌনভাবে রহিলেন দেখিয়া,বিনয়ভূষণ অত্যন্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—শরৎ আমার কথার কি কোন উত্তর দিবে না, আমাকে কি বলিবার কিছু নাই? শরৎচন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, “বিনয়! সে দিকেও আগুণ লাগিয়াছে।” বিনয়ভূষণ চমকিত হইলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি বলিলেন, “শরৎ! কোন দিকে আগুণ লাগিল, কে—তুমি কি জান?” শরৎ বলিলেন—জানি বলিয়াই ত আসিয়াছি, এই কথা বলিতে না বলিতে, বিনয়ভূষণের স্বপ্ন সত্যেতে পরিণত হইল—তাঁহার মনের সম্মুখে যে বিস্মৃতির আবরণ পড়িয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল। তখন দিব্যচক্ষে দেখিলেন, সে চিত্তমুগ্ধকারী—সেবা-প্রিয়—প্রেমপূর্ণ ছবিখানি—কেবল ছবি নহে—স্বপ্ন নহে—কল্পনা নহে—সে সরমা! বিনয়ভূষণ! তুমি কোথায়? তোমার শরীর মন অবসন্ন হইল কেন? ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছ না কেন? এ কি হইল! শরৎ বলিলেন, “গোপাল বাবু তোমাকে চিনিতেন না, তুমি পীড়িত, দোকানে পড়িয়াছিলে, তোমার চিকিৎসা হইতেছিল না, সেরূপ অবস্থায় থাকিলে, তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া উহাঁর কোমল প্রাণ আকুল হইল, তোমাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন, পরিবার পরিজনে সমবেত হইয়া, তোমার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পীড়িত শয্যাগত বিনয়ভূষণে কি ছিল জানি না, হতভাগিনী

সরমা রোগীর সেবা করিতে করিতে আপনার প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহার মাকে তাহা বলিয়াছে, কন্যাগতপ্রাণা জননী একথা গোপন করিতে পারেন নাই, ক্রমে তাহা গোপাল বাবুও শুনিলেন। গোপাল বাবু তোমার সহিত বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন।” বিনয়-ভূষণ তখন দেখিলেন, স্বপ্নে অনুভূত সে ছবি সরমারই বটে, তখন এত আনন্দ হইল যে, চক্ষে জল আসিল বিনয়ভূষণের দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল, তিনি কল্পনার চক্ষে দেখিলেন সরমা আনতবদনে, সুমিষ্ট প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। বিনয়ভূষণের বিষণ্ণ মন এক মুহূর্তের জন্য প্রসন্ন হইল—শান্তি লাভ করিল—আশায় বুক বাঁধিলেন, ভাবিলেন আমি জীবন পণ করিয়া আত্মরক্ষা করিব, মরি আর বাঁচি, “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

রজনীতে বিনয়ভূষণ শরৎচন্দ্র ও গোপাল বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে আপাততঃ পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই, তবে সে পলায়ন কি রূপে সাধিত হইবে, এই চিন্তায় অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। অনেক চিন্তার পর, এই স্থির হইল যে গোপাল বাবু ও শরৎচন্দ্র সদর বাটীতে সতন্ত্র

শয়ন করিবেন, বিনয়ভূষণ অন্যান্য দিনের ন্যায় গৃহের মধ্যে শয়ন করিবেন এবং রাত্রিতে জননী ও ভগিনী ঘুমাইলে, বিনয়ভূষণ চুপে চুপে উঠিয়া একাকী পলায়ন করিবেন; এইরূপ স্থির করিয়া গিয়া শয়ন করিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনয়ভূষণ তাঁহার মাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জননী তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না। অনেক ভাবনা চিন্তাতে ক্লান্ত হইয়া বিনয়ভূষণ নিদ্রিত হইলেন। বিনয়ের ভগিনী তার মাকে বলিল, "মা, দাদা বিবাহ করিতে চান না, তবে তাঁকে ধরে বেঁধে বিয়ে দেবার দরকার কি? এক জনের ইচ্ছে নেই, আর তোমরা তাকে ধরে বেঁধে বিয়ে দেবে, এ আমার কাছে বড়ই অন্যায় বলিয়া মনে হয়। দাদাকে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে দেওয়াই ভাল। এর পর যদি কিছু ভাল মন্দ হয়—যদি বউ ভাল না হয়, তবে তোমাদের চিরদিন গঞ্জনাভোগ করিতে হইবে। বড়দাদা কিছু চিরদিন তোমাদিগকে দেখিবেন না, তোমার একমাত্র ছেলেকে অসুখী করিয়া তোমার আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না।" মনোরমার মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "হাঁরে, হাঁ, তোর আর গিন্নেপনা কত্তে হবে না। তুই বুঝিস কি, বল্‌ত?" মনোরমা বলিল "আমি বেশ বুঝিয়াছি কি হইবে, দাদাতে বড়দাদাতে চিরদিনের মত একটা মনান্তর হবে। তোমাকে বাধ্য হইয়া শেষে তোমার অসহায় সন্তান দুটি লইয়া ভাসিতে হইবে, আমি ছেলেমানুষ সত্যি কিন্তু আমার কথা মনে রেখ।" এই বলিয়া মনোরমা মনের দুঃখে নিজেদের ভবিষ্যত ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বৃদ্ধা একাকিনী আর কি ভাবিবেন,

দুই একবার হাই তুলিতে তুলিতে "হরি হে তুমিই ভরসা" বলিতে লাগিলেন—আবার ভাবিলেন তাইত আমার ভালমনুষ ছেলে এর এমন দুর্ম্মতি হইল? আমার ছেলেমানুষ ছেলে—ভাল করে দাড়িগোঁফ ওঠেনি—আহা আমার দুধের বাছা—এত অল্প বয়সে বিগ্‌ড়ে গেল। এবার ত ছেলেকে বিবাহ না দিয়া কিছুতেই যাইতে দিব না। রাত পোয়ালেই তার আয়োজন করিতে বলিব, আর না, বাপ্‌রে আমার ছেলে ব'য়ে যাবে। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষ হইল, বৃদ্ধার চক্ষে ঘুম আর আসিল না—রাত্রি কাটিল—বিনয়ভূষণ রাত্রি শেষে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার জননী জাগিয়া আছেন—মাকে জাগরিত দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল—তিনি ভাবিলেন গভীর রাত্রে হয়ত মা ঘুমাইয়াছিলেন, তখন তিনি জাগিয়া থাকিলে পলায়ন করিতে পারিতেন। আবার ভাবিলেন, যে সময়ে মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতে আমার পালান আর ঘরে থাকা একই কথা, কারণ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ত সকলে জানিতে পারিত যে আমি গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছি, তাহা হইলেই আমার সকল চেষ্টা বিফল হইত। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতের সুমন্দ ও সুস্নিগ্ধ সমীরণে চারিদিক কম্পিত হইতেছে, বিনয়ভূষণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দর্শন চিন্তায় কম্পিত হইতেছেন, বিনয়ভূষণ জানিতেন না, যে, সে দিন তাঁহার বিপদের দিন—তিনি জানিতেন না যে তাঁহার কিশোর বয়সের সুখ ও কৌমার্য্যের স্বাধীনতা উদিত সূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে চির অস্তগত হইবে—বিনয়ভূষণের দাদা

বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, এই দুইজন লোক বিনয়কে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেছে এবং তাহাদের কুমন্ত্রণাতে পড়িয়া ভায়া তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে বাধা দিতেছেন। যাহা হউক তাঁহার বিশ্রাম নাই, তিনি ভিতরে ভিতরে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধির সমস্ত আয়োজন করিতেছেন এবং এরূপ অবস্থাতে যাহাতে বিনয়ের নবাগত বন্ধুদ্বয় তাঁহার কার্য্যে শত্রুভাব ধারণ না করেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। তিনি এবং বৃদ্ধা গৃহিণী পরামর্শ করিয়া সেই দিনই বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন। কন্যাকর্ত্তাকে পূর্ব্ব হইতে বলা আছে যে, যে দিন তাঁহারা সুবিধা বোধ করিবেন, সেই দিনই বিবাহ দিতে হইবে। কন্যাকর্ত্তা কথঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন লোক—সাধারণ ভাবে সংসারে কিছুরই অপ্রতুল নাই। ভাল কুলীনের ছেলে পাইয়াছেন, তাহাতে ছেলেটি বেশ লেখা পড়া শিখিতেছে—দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—ছেলের স্বভাব চরিত্র ভাল—তিনি তাঁহার কন্যারত্নটিকে যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন—লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, সৎস্বভাবসম্পন্ন করিতে বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছেন—লোকে বলিতেছে আর কত দিন মেয়েকে আইবড় রাখিবে—একটু বড় হয়ে পড়েছে—আজ কাল করিতে করিতে কন্যা চৌদ্দ বৎসরে পা দিয়াছে—এই সকল চিন্তা করিয়া কন্যাকর্ত্তাও যে দিন প্রয়োজন হইবে, বিবাহ দিতে সম্মত আছেন। হৃদয়ভূষণ প্রাতে কন্যাকর্ত্তাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে অদ্য ও আগামী কল্য বিবাহের দিন আছে—আপনার যদি সমস্ত

প্রস্তুত থাকে,তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, অদ্যই হউক বা কল্যই হউক, বিবাহের দিন স্থির করিয়া, এই লোক দ্বারা আমাকে সংবাদ দিবেন।

ইত্যবসরে হৃদয়ভূষণ তাঁহার বিমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি বিনয়কে বল, যে তাহার লেখা পড়ার অনেক ক্ষতি হইতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া, আজই সে বিবাহ করুক, বিবাহ করিয়া দুই এক দিন পরে সে কৃষ্ণনগর যাইবে।" এই বলিয়া দিয়া তিনি বিনয়ভূষণের বন্ধুদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করিতে গেলেন। তাঁহাদের দুই জনকে বলিলেন, "দেখুন আমার কনিষ্ঠের বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি, অদ্য সেই বিবাহের দিন, আপনারা দয়া করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, যদি আত্মীয়তা-পরতন্ত্র হইয়া বিবাহে উপস্থিত থাকেন, তবে আমি যার পর নাই সুখী হই এবং নিজকে নিতান্ত অনুগৃহীত মনে করি।" গোপাল বাবু ও শরৎচন্দ্র এই কথা শুনিয়া কি উত্তর করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, মহাশঙ্কটে পড়িয়া ক্ষণেক অবাক হইয়া রহিলেন, ও মনে মনে লোকটির বুদ্ধি চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, পরক্ষণেই বলিলেন, "বিনয়ভূষণকে আমরা ভালবাসি, তাহার বিবাহে উপস্থিত থাকা বড়ই প্রীতিপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে তাহার নাকি এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, যদি তাহার বিবাহের ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতে চেষ্টা করা এবং তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করাটা কি বিবেচনার কার্য্য?" হৃদয়ভূষণ বলিলেন, "মা ও আমি পরামর্শ

করিয়া যাহা করিতেছি, তাহাতেই তাহার কল্যাণ হইবে, তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই করিতেছি, সে ছেলেমানুষ তাহার ছেলেমানুষের মত থাকাই ভাল দেখায়; তাহার বিবাহ হইলে, আবার কিছুদিন পরে এসমস্ত ঝোঁক কাটিয়া যাইবে, তখন বুঝিতে পারিবে, যে আমরা যাহা করিযাছি তাহাই ভাল হইয়াছে।" শরৎচন্দ্র বলিলেন, "আপনি তাহার অভিভাবক—আপনি যাহা করিবেন, আমরা অপরিচিত লোক, তাহার প্রতিবাদ করা কিম্বা আপনার সঙ্গে তর্ক করা, আমাদের পক্ষে ভাল দেখায় না; আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন, বিনয়ভূষণ যাহা ভাল বুঝিবে, সে তাহাই করিবে, তাহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিব, সে যদি প্রসন্ন মনে বিবাহ করিতে যায়, তবে আমরা বিশেষ উৎসাহের সহিত বিবাহ দেখিতে যাইব, নতুবা যাইবনা।" হৃদয়ভূষণ বাটীর ভিতরে গিয়া দেখেন বিনয়ভূষণ মায়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, মা গালে হাত দিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন— ছেলেরা ব'য়ে গেলে, এমনই হয় যে, বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না কর্ত্তেও নারাজ হয়, কি সর্ব্বনাশ! এই ভাবিয়া বিনয়ের হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি তোমাকে বেশি কষ্ট দিতে চাই না—একটা কথা বলি শুন—তুমি আমার কথা রাখ্‌বে কি না? যদি রাখ্‌তে চাও, তবে বিবাহ কর, আর না রাখ্‌তে চাও, আমায় স্পষ্ট করিয়া বল, আমি আর তোমাকে কষ্ট দিব না, তোমাকে সুখী করাই আমার কামনা, যদি না হয়, তুমি তোমার ইচ্ছামত পথে চল, আমি তোমাকে কিছুই বলিব না—বল আমার এই শেষ কথা রাখবে কি না?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া বিনয়ভুষণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, না—মা, আমি বেঁচে থেকে, তোমাকে ক্লেশ দিতে চাই না—আমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার আদেশ পালন করিতে একটুও অন্যথা করিব না—ইহাতে আমার কল্যাণ হয় হউক, আর আমার সর্ব্বনাশ হয় হউক। শরৎকে ডাকাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভাই! আমার মনের আশা পূর্ণ হইল না—মায়েরও মনের আশা পূর্ণ হইল না—আমি তোমাকে বলিয়াছি যে, মা দাদার কুহকে পড়িয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে—সুখী করিতে গিয়া, যদি আমি মরি, সেই আমার সুখ—আমার মায়ের আর কেহ নাই—মায়ের দিকে তাকাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—মা—তুমি যে গরল-পাত্র আমার হাতে তুলিয়া দিতেছ, উহাই আমার অমৃত—আমি উহাই পান করিব—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মন ছুটিল।

বৎসরাধিক কাল হইতে গেল, বিনয়ভূষণ কৃষ্ণনগরে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছেন। সময়ে সময়ে গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে—গোপাল বাবু অতি সরল স্বভাবের লোক, সততা ও সাধুতা একত্র হইয়া তাঁহার জীবনটিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। গোপাল বাবু বিনয়কে দেখিলেই বলেন, "একবার আমাদের বাড়ীতে যাবে।" বিনয়ভূষণ লজ্জায় মুখখানি হেঁট করিয়া, গোপাল বাবুর কথাগুলি শুনেন—বড় পীড়াপীড়ি করিলে বলেন, "আচ্ছা যাইব"। কিন্তু যাইবার সময় উপস্থিত হইলে, আর বিনয়ভূষণের পা চলে না—বুকের ভিতর কেমন এক ভাব হয়—বিনয়ভূষণ অবসন্ন মনে বসিয়া পড়েন—যাওয়া আর হয় না। এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে একদিন গোপাল বাবু, শরৎচন্দ্র ও বিনয়ভূষণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, গোপাল বাবু ও তাঁহার পরিজনেরা সকলে বিনয়ভূষণকে অতি সৎলোক বলিয়া জানিতেন এবং অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—বিনয়ের সততা ও তাঁহাদের ভালবাসা, তাঁহাকে তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিত্য-চিন্তার বিষয় করিয়া রাখিয়াছে। বিনয়ভূষণ প্রথমতঃ নিমন্ত্রণ কিছুতেই নিতে চান না—পরে গোপাল বাবুর অত্যধিক যত্নে পরাজিত হইয়া অগত্যা গ্রহণ করিলেন। সে দিন

সেথানে অনেক সুখ দুঃখের কথায় সময় কাটাইলেন। গোপাল বাবুর গৃহিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে, কত বার যে বিনয়ের চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গণনা হয় না, মনে যে আগুণ দিবানিশি জ্বলিতেছে—সেই অনল তরল হইয়া নয়ন প্রান্তে দেখা দিতেছে। আর একজন নির্জ্জনে—সংগোপনে বসিয়া বিনয়ভূষণের মিষ্ট কথাগুলি শুনিতেছেন—তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষিত হইতেছে—কিন্তু হৃদয় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—এ কে? অনুরাগ, সদ্ভাব ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় বিনিময় করিতে গিয়া সংসারের নিষ্ঠুরতার হস্তে প্রবঞ্চিত হইয়াছে—চিরনিরাশার ঘন তিমিরে যাহার ক্ষুদ্র প্রাণ ডুবিয়া আছে, এ সেই সরমা—একা এক ঘরে বসিয়া, চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজাইয়া বুকে ধরিতেছেন—যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন—তবু সে শিকলকাটা পাখীর মিষ্ট কথা শুনিয়া, আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। গৃহিনী বলিলেন, "বাবা, বোউ কেমন হ'ল দেখাবে না—সরমা বোউ দেখিতে চাহিতেছে—তোমাকে আমরা এত ভালবাসি—তোমার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিলে না, বোউও দেখালে না। বিনয়ভূষণ এই সকল কথায় আরও লজ্জিত হইলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। "সরমা বোউ দেখিতে চাহিতেছে" শুনিয়া প্রাণ চমকিত হইল—হৃদয় কম্পিত হইল—প্রাণে যন্ত্রণার সঞ্চার হইল। বিনয়ভূষণ ও শরৎচন্দ্র দুইজনে বাসায় আসিলেন হৃদয়ের আবেগ—প্রাণের যন্ত্রণা শরৎকে বলিলেন—দুইজনে একত্র থাকেন—দুইজনে—দুইজনের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে-

ছেন—উভয়ে উভয়ের প্রাণের সকল কথাই জানিতে পারেন—কেহ কোন কথা গোপন করেন না। এইরূপে সুখে দুঃখে—বন্ধুসহবাসে এক বৎসর কাল কাটিয়াছে—এবার এল, এ পরীক্ষা দিবার বৎসর—ভাল করিয়া লেখা পড়া করা চাই—নতুবা পাস করা কঠিন হইয়া পড়িবে। যেরূপ অশান্তিতে এক বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম না করিলে, আর কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই—এই ভাবিয়া সকল চিন্তা দূরে ফেলিয়া দিলেন, প্রাণপণ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—বিনয়ভূষণও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময়ে বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে, হৃদয়ভূষণ, তাঁহার মা ও ভগিনীকে বড় ক্লেশ দিতেছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র অতীত চিন্তা সকল আবার নূতন করিয়া প্রাণে জাগিয়া উঠিল—শরৎকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার মনে হয়, একদিন যে দাদার সদভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছিলে, এই নাও তাঁহার ভবিষ্যৎ সদভিপ্রায়ের নমুনা আসিয়াছে, এই বলিয়া পত্র খানি ফেলিয়া দিলেন। শরৎ পাঠ করিয়া বলিলেন—বেশ—এত দিন যে শান্তিতে গিয়াছে, এই সুখের বিষয়, কেন গিয়াছে তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছে? তাঁহার এই শেষ পক্ষের স্ত্রীটি এতদিন ছেলে মানুষ ছিলেন, সম্রাজ্ঞীত্বপদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া, এতদিন শান্তিতে গিয়াছে—এখন তিনিই স্বামীর পরিচালক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহারই ফলস্বরূপ এই সকল অনিষ্টপাত হইতেছে। তিনি বিনয়ভূষণকে বলিলেন—দেখ পরীক্ষার আর অতি অল্প দিন আছে—এমন সময়ে মনে

একটা অশান্তিকে স্থান দেওয়া কোন মতে বিবেচনার কার্য্য হইবে না। অনন্যমনা হইয়া এই কয়দিন পাঠে নিযুক্ত থাক —তোমার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহাতে আবার যেরূপ পরিশ্রম সহকারে পড়িয়াছ, আমার বিশ্বাস যে তোমার পাস হইবার কোন সন্দেহ নাই—এমন কি স্কলারসিপ্ পাইলেও পাইতে পার। বিনয়ভূষণ বলিলেন, ভাই স্কলারসিপ্এ কাজ নাই, আমি পাস করিতে পারিলে, কোথাও একটা কর্ম্ম কাজ করিতে করিতে বি এ, পরীক্ষাটা দিতে পারি, আমার উন্নতির পথটা পরিষ্কার হয়। পরীক্ষার আর বিলম্ব নাই; ক্রমে পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। সম্বৎসরের পরিশ্রম ও নানা অশান্তি ও দুর্ভাবনাভারে অবসন্ন দেহ মন লইয়া বিনয় ভূষণ পরীক্ষাতে অগ্রসর হইলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার জ্বর হইল, প্রথম দুই দিন বেশ লিখিলেন, তৃতীয় দিন অসুস্থ শরীরেও এক প্রকার লিখিয়া আসিলেন, চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে একবারে শয্যাগত হইলেন। শরৎ পরীক্ষাতে ব্যস্ত, গোপাল বাবু সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ভূষণের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত, যদি কোন প্রকারে তাঁহার দ্বারা পরীক্ষাটা দেওয়াইতে পারেন। উত্থানশক্তি নাই তবুও বিনয়ভূষণ পরীক্ষাস্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা পারিলেন শেষ দুই দিন লিখিলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের উন্নতির আশা ভরসা সমস্তই এই সঙ্গে সন্দেহের ক্রোড়ে শয়ন করিল। পরীক্ষান্তে কয়েক দিন সাবধানে থাকিয়া ও ঔষধাদি সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। মনে মনে ইচ্ছা যে তাঁহার প্রিয়বন্ধু শরতের সঙ্গে তাঁহাদের

বাড়ীতে বেড়াইতে যান। শরৎকে একথা বলিয়া, এক প্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দাদার নিকট হইতে এক পত্র আসিল, তাহার মর্ম্ম এই—তোমার শ্বশুর মহাশয়ের বড় ইচ্ছা, যে তুমি একবার তাঁহাদের ওখানে যাও—মাতাঠাকুরাণীর ও আমার অভিপ্রায় এই যে, এবার ছুটীতে বাড়ী আসিবার সময়ে, কুসুমপুরে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পরে বাড়ী আসিবে।

বিনয়ভূষণের সে সময়ে শ্বশুরালয়ে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। তবে না যাইতে বলিয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাকে কুসুমপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত করিল। তিনি শ্বশুরের যে পত্র পাইয়াছিলেন, তদুত্তরে দিনস্থির করিয়া, তাঁহার প্রস্তাবিত লোক কৃষ্ণনগরে না পাঠাইয়া, পথের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইতে বলিলেন। বিনয়ভূষণ কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্বশুর প্রেরিত লোক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু পাইলেন না, না পাইয়া বড় অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন, বিবাহের পর সেখানে এই নূতন যাইবেন, সঙ্গে কেহ না থাকিলে একাকী যাইতে তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইবে ভাবিয়া, তিনি যাওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণনগর ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন, স্থির করিলেন বটে, কিন্তু কে যেন চুপে চুপে—অলক্ষিত ভাবে—প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছে—একবার যাও—সেখানে একজন তোমার যাইবার কথা শুনিয়া, কতমতে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছে—তাহার প্রাণের ভিতর, কত অভিনব চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত—সে ভাব—সে চিন্তা, কখন সে সরলা বালিকার

কোমল প্রাণে উদয় হয় নাই—আজি সেই তীব্রতর চিন্তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রেমমালার প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে—নূতন ভাব—নূতন বেশে দেখা দিয়া, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—একবার গিয়া দেখ, সে তোমাকে দেখিবার জন্য—তোমাকে পাইবার জন্য, কত ব্যস্ত, যেই বিনয়ভূষণ মনে মনে একবার যাওয়ার কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, অমনি কি এক নূতন ভাব, তাঁহার মন প্রাণকে অধিকার করিল—কি এক দুর্লক্ষ্য সূত্র—অপরিজ্ঞাত যোগ—তাঁহাকে তাঁহার জীবনপথের অপরিচিতা সঙ্গিনীর নিকটস্থ করিল—তিনি কল্পনাচক্ষে দেখিলেন—জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নেতে দেখিলেন—প্রেমমালার প্রেম ও সদ্ভাব তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিতেছে—শারদায় পৌর্ণমাসী যামিনীর স্নিগ্ধ—রজত কিরণজাল যেমন অলক্ষিত ভাবে কবির মনাকর্ষণ করে—কবিকে সেই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবাইয়া দেয়—সরোবরভূষণ বিকসিত কমলিনী আপন সৌরভপূর্ণ রূপে চারিদিক আলোকিত করিলে, ভ্রমর সুদূরস্থান হইতে অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদ্মমধুপানে যেমন ধাবিত হয়—সেইরূপ অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ প্রাণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিনয়ভূষণ প্রেমমালাকে দেখিতে—তাঁহার পরিচয় পাইতে—তাঁহার সঙ্গলাভজনিত সুখে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন। এমন সময়ে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কোথায় যাইবেন?" বিনয়ভূষণ বলিলেন, "তুমি কাকে চাও?" লোকটি বলিল, "আমি একটি বাবুর অনুসন্ধানে আসিয়াছি, আপনার নামটি কি বলিবেন?" বিনয়ভূষণ বলিলেন—আমার নাম বিনয়ভূষণ

ঘোষ। লোকটি বলিল "আজ্ঞে আমি আপনারই জন্যে আসিয়াছি, কাল হইতে আপনাকে খুঁজিতেছি। আপনার আহারাদি হয় নাই?—আমি আপনার খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিব কি?" বিনয়ভূষণ বলিলেন—আমি সকালে কৃষ্ণনগর হইতে আহার করিয়া আসিয়াছি—তুমি নৌকা ঠিক কর, এখনই নৌকা ছাড়া যাবে। লোকটি বলিল, "আজ্ঞে বাড়ী হইতে নৌকা আসিয়াছে—মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে নৌকা প্রস্তুত হইল, বিনয়ভূষণ নৌকাতে উঠিলেন—যথাসময়ে নৌকা কুসুমপুরের ঘাটে আসিয়া পোঁছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

নূতন জামাই আসিয়াছে, তাতে আবার পাস করা ছেলে, পল্লীগ্রামে এমন ছেলের কত আদর—পাড়ার লোক বিনয়-ভূষণকে দেখিতে আসিল—বিনয়ভূষণ একবার শ্বাশুড়ীর আহ্বানে, বাড়ীর ভিতর মেয়ে মহলে, দেখা দিতেছেন—আবার শ্বশুরের আহ্বানে সদরবাটীতে আসিতেছেন—এইভাবে আলাপ-পরিচয়ে, আহারাদিতে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। পরিহাসপ্রিয় আত্মীয়গণের হাতে বিনয়ভূষণকে একটু লাঞ্ছনা ভোগ করিতেও হইল—তবে শ্বশুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া তাঁহাকে বড় বেশি অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।

এইবার প্রেমমালার সহিত দেখা হবে—ভাবিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—ভয় হইল—ভাবনা হইল—উচ্ছ্বাসও হইল—কি দেখিবেন—কি বলিবেন—আশা সুখের পথে চলিবে—প্রাণ প্রেমফুলের মালা গাঁথিবে, কি দুঃখের ধূলা কুড়াইবে—মন ফুল ফুটিবে, কি শুকাইবে—প্রেমের-বন্ধনে হৃদয় বাঁধিবে, কি প্রেম-পুষ্প-ভরা হৃদয় বিমুখ হইয়া বসিবে—আমি কি তার, সে কি আমার? আজ বিনয়ভূষণের হৃদয় এই ঘোর আশা নিরাশার যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে—ক্ষণকালের জন্য বিনয়ভূষণের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল—চঞ্চল মন প্রাণ লইয়া বিনয়ভূষণ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন; শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাঁহার কল্পনা-বিতাড়িত হৃদয় সরোবরের কমলিনী প্রস্ফুটিতপ্রায় সৌন্দর্য্য রাশিতে ঘর আলো করিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি গৃহ প্রবেশ করিতে না করিতে, পূর্ণিমার চাঁদ ঘন মেঘের অন্তরালে লুকাইল—প্রেমমালা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, সে মুখের শোভা ঘর আলো করিয়াছে—অদ্ধাবৃত মুখে ভয় ভাবনা আনন্দ ও উল্লাস—নূতনভাবে খেলা করিতেছে—কেমন সুন্দর!—কেমন মনোহর। সে দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইল—তিনি নিরাশার মধ্যে আশার আহ্বান শুনিলেন। বিনয়ভূষণ ঘরের দ্বারটি বন্ধ করিয়া শয্যাতে উপবেশন করিলেন। অনেক ক্ষণ উভয়ে নিরুত্তর বসিয়া, রহিলেন। বিনয়ভূষণ আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কি কথা কবে না?" প্রেমমালার কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল—কি এক অব্যক্ত ভাবে প্রাণ

পূর্ণ হইয়া গেল—হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। একবার বলিলেন, আবার বলিলেন, দুই তিন বার অতি মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কবাব পর আবার বলিলেন, "তুমি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না?" প্রেমমালা নতমস্তকে একটু মৃদুহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করিব? কি জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। আপনার ইচ্ছা হইলে, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, আমি আপনার সব কথার উত্তর দিব।"

বিনয়। আপাততঃ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।

প্রেম। কি বলুন?

বিনয়। ঐ "আপনি" ও "বলুন" কথাগুলি ছাড়িতে হইবে।

প্রেম। তবে কি বলিব?

বিনয়। কেন "তুমি" বলিয়া কথা কহিবে, আর "বলুন"এর যায়গায় "বল" বলিবে।

প্রেম। না আমি আপনাকে "তুমি" বলিয়া কথা কহিতে পা'র্ব না—আমার বাধ, বাধ, ক'র্বে।

বিনয়। একবার চেষ্টা করে দেখ। আচ্ছা বিবাহের পর এক রাত্রিতে যে আমরা দুজনে একত্র ছিলাম, সে দিন আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কি তাহার উত্তর দিতে না?

প্রেম। আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দাওয়া কি আমার অসাদ্য? তবে সে দিন প্রথম দিন, দরকার হলেও

হয়ত পার্তুম্ না। এখনও ভাল ক'রে কথা বলিতে পার্‌ছি না।

বিনয়ভূষণ ভাবিলেন আজ আর বেশি কথা কহিয়া কষ্ট দিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনয়ভূষণ নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল—প্রভাত হইল সত্য—কিন্তু বিনয়ভূষণ ও প্রেমমালার জীবনে এমন সুপ্রভাত আর কখনও হয় নাই—প্রভাতের সুমন্দ মারুতহিল্লোল অনেক দিন অঙ্গে লাগিয়াছে—নব-রবিকিরণ নানা বর্ণে প্রকাশিত হইয়া শরীর মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করিয়াছে—উষার বিহঙ্গম-গীতি ও শ্রবণ জুড়াইয়াছে—তাঁহারা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বজন-বর্গের প্রীতিপূর্ণ মুখ সন্দর্শনও করিয়াছেন—কিন্তু আজ সকলেই এক নূতন বেশে দেখা দিল। আজ তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহাই মধুময়—সুমন্দ সমীরণ আজ অমৃতসিঞ্চন করিতেছে—নানা রাগ রঞ্জিত নবভানু আজ বিধাতার বিধানকে নূতন শোভাতে সাজাইয়াছে—চক্ষে কি প্রেমের কাজল পরাইয়া দিয়াছে—কর্ণে কি প্রেমের লহরী তুলিয়াছে—আজ প্রাতে উঠিয়া পিতামাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিতেছে—সকলের মুখে প্রেম, ভাল-বাসা, শান্তি ও সদ্ভাব। পাখীর গান—বাতাসের ঢেউ—সূর্য্যের উঁকি মারা—পিতা মাতার মিষ্ট আহ্বান—ভগিনীর প্রিয় সম্ভাষণ—আজ তাঁহাদের প্রাণে, বিশেষভাবে প্রেমমালার প্রাণে স্বর্গীয় সুখবিধান করিতেছে, তিনি আজ অজ্ঞাতসারে আনন্দ-ভারে একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। বেচারার অপরাধই বা

কি? সকলে মিলিয়া এক বালিকার উপর এত অত্যাচার করিলে, সে কি করিয়া সহ্য করিবে?

আহারান্তে প্রেমমালা খিড়কীর পুকুরে আচাঁইতে গিয়াছেন। ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছে, প্রেমমালা বলিলেন, ঝি, আজ বাসন কিছু বেশি হয়েছে আমি খানকতক মেজে দিই, এই বলিয়া বাসন মাজিতে ব'সে গেলেন। ঝি বলিল বড়দিদি আমি পারবো, তোমাকে আর হাত ময়লা কত্তে হবে না, শেষে জামাই বাবু দেখ্‌লে আমার কম্মটুকু যাবে।

প্রেম। যা বাপু, তোর আর নেকাম ক'রতে হবে না।

পাড়ার একটি মেয়ে তাঁহার সঙ্গিনী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—কথাটাত বল্লে বটে—কিন্তু মনের ভাবটা যে মুখে বেরহয়ে পড়্‌ল।

প্রেম। মনের কি ভাব?

সঙ্গিনী। মানুষ বাপ কল্লে কি কষ্ট পেলে, তার মুখ দেখ্‌লে যেমন তাহা জানা যায়, তেমনি মানুষের মনে সুখ থাক্‌লে, মুখে তা ধরা পড়ে।

প্রেম। কেন আমার মুখ দেখে কি কিছু বুঝা যায়?

সঙ্গিনী। তোমার মা বল্‌ছিলেন, "আজ মেয়েটা আমার কি সুন্দর দেখাচ্ছে!" আমি কেন তোমাদের বাড়ীর সকলেই টের পেয়েছে যে তুমি আজ নূতন "প্রেমমালা" সেজেছ।

প্রেম। কেন আমি ত ভয়ে ভয়ে, চোরের মত এক পাশে থাক্‌তে চেষ্টা কচ্চি।

সঙ্গিনী। তাতে কি মনের ভাব ঢাকা থাকে? তাতেই ত আরও ধরা পড়ে—সাবধান হয়ে চল্‌ছ তাও ধরা পড়েছ।

এইভাবে বেলাটি কাটিল, প্রেমমালা মুহূর্ত্ত পরে মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছেন, কতক্ষণে আবার তাঁহারই সঙ্গে দেখা হ'বে, যাঁহার সঙ্গলাভে প্রাণে এক অব্যক্ত সুখের সঞ্চার হইয়াছে। আবার সে সুখের মুহূর্ত্ত দেখা দিল।

গৃহ প্রবেশ করিয়া বিনয়ভূষণ শয্যাতে উপবেশন করিলেন। প্রেমমালা প্রসন্নতা-পূর্ণ মুখখানিকে লজ্জার আবরণে আবৃত করিয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। বিনয়ভূষণ সেই চিত্তমুগ্ধকারী চিত্রে ডুবিয়া গেলেন—ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া সেই মুখ-কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই লাবণ্য-সুধা পান করিয়া মরণশীল জীবনে অমর-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। সুসময় বুঝিয়া বিনয়ভূষণ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কিছু লেখা পড়া ক'রে থাক?

স্ত্রী। বাবা আমাদের লেখা পড়া শিখাইতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, তিনি সেকেলে ধরণের লোক, তবুও মেয়েদের জ্ঞানোন্নতির জন্য যে চেষ্টা হয়, তিনি তাহা খুব পছন্দ করেন। আমাদের এ দেশের মেয়েদের পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি সভা আছে। বাবা নিজে আমাদিগকে বাড়ীতে পড়াইয়া, সেই সভায় পরীক্ষা দেওয়াইয়াছেন। এখনও বাবা আমাকে আর সুধাকে (ছোট ভগ্নী) পড়াইয়া থাকেন।

বিনয়। তুমি—সম্মিলনীর কোন্ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়াছ?

স্ত্রী। আমি এই বৎসর ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়াছি—আমি যে সকল বই ও অন্যান্য জিনিস পুরস্কার পাইয়াছি সে গুলি বড় সুন্দর। আর সভার কর্ত্তৃপক্ষরা পরীক্ষাতে সন্তুষ্ট হইয়া একখানি ছোট ছাপান কাগজে প্রসংশা-পত্র লিখিয়া দিয়া-

ছেন। প্রেমমালা উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া বিনয়ভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি দেখ্‌বে? বলেই একটু অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া আবার কথাটা সারিয়া লইতেছিলেন, এমন সময়ে বিনযভূষণ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেমমালার সরল মুখখানি দেখিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "এতক্ষণ পরে তুমি আমার প্রাণের আরও একটু নিকটে আসিলে।"

প্রেম। আমি—ই—আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে যে ভাবে কথা কই, ভুলে আপনাকেও সেই রকম সঙ্গী মনে ক'রে ঐরকম ব'লে ফেলেছি। বড় অন্যায় হয়েছে।

বিনয়। দেখ, তোমার অন্য কোন অন্যায় কাজ নয়, কেবল ঐ অন্যায় কাজটি স্থায়ী হইলে, আমি বড়ই সুখী হই। তুমি আমার কথা কি শুনিবে না?

স্ত্রী—বলিলেন শুনিব বইকি। তোমার কথা শুনাই আমার সুখ—আমার ইচ্ছা এই যে, ছায়া যেমন মানুষের সঙ্গে চলে—আমি তেমনি চিরদিন তোমার সঙ্গে চলিব।

বিনয়ভূষণ দেখিলেন রূপলাবণ্যে, স্বভাব ও রীতিনীতি'ত শিক্ষা ও সদ্‌গুণে প্রেমমালা সুশোভিতা—অর্থলোলুপ ভ্রাতার হাতে তিনি যে একবারে বিনষ্ট হন নাই—তাঁহার সুখের আশা যে আছে—তিনি যে চেষ্টা করিলে, সৌভাগ্য-সোপানে উঠিতে পারিবেন—ভবিষ্যতে তাঁহার সংসার যে সুস্বভাবসম্পন্না স্ত্রীর বিচরণে পবিত্র হইবে—সুখ ও আনন্দ যে তাঁহার ভাবী গৃহকে পূর্ণ করিবে—এ চিন্তা তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে আজ যে কত সুখের দিন তাহা তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভাল করিয়া অনুভবই করিতে

পারিলেন না—তিনি যাহা শুনিলেন—যাহা দেখিলেন—তাহা তাঁহার নিকট দৈববাণীবৎ প্রতীয়মান হইল—যাহা কখন আশা করেন নাই—হৃদয় মন যে অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নাই—যাহার চিন্তামাত্র তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিযাছিল, সেই অনিচ্ছায় অনুষ্ঠিত কার্য্য, আজ তাঁহার প্রাণের আঁধার গুহায় প্রেমের আলো জ্বালিয়াছে—তাঁহার মরুপ্রায় নিরাশ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। যাহাকে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করিতে গভীর চিন্তা ও বিশেষ উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন হইত—যাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, চিরদিনের জন্য জীবনটা শ্বাপদপূর্ণ বনভূমিতে অথবা অশান্তির মরুভূমে পরিণত হইত, আজ বিধাতার কৃপাবিধানে এ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাহার আশা বৃক্ষ আপনা হইতে আশাতীত সুফল উৎপন্ন করিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল—আজ তাঁহার জীবন-পথ অধিকতর সরল—অধিকতর মধুময় ও সুখজনক—এ চিন্তা তাঁহার নিকট এতই তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং এ সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল যে কোন্ কথা সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি ক্ষণেক অবাক হইয়া প্রেমমালার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই আবার সংযতচিত্ত হইয়া বলিলেন—দেখ প্রেমমালা, আজ তুমি আমার হৃদয়ে যে আনন্দ স্রোতঃ প্রবাহিত করিলে, পরমেশ্বরের কৃপায় ইহা যেন অনন্তকাল স্থায়ী হয়—অসময়ে আমার বিবাহ হওয়াতে, আমি বড় অসুখী ছিলাম—আমার হৃদয় সতত অশান্তির ক্রীড়া-ভূমি বলিয়া অনুভূত হইত—

বিবাহের পর অনেক সময়ে নিজেকে বিপন্ন বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আমি ভাবিতাম—হয়ত আমার ও তোমার স্বভাব ও প্রকৃতি—রুচি ও ইচ্ছা—আশা ও আকাঙ্ক্ষা—মত ও বিশ্বাস পরস্পরের সহিত মিলিবে না—সমভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন অসম্ভব—আর সে অবস্থায় আমি তোমার ও তুমি আমার ধর্ম্মপথের সহায় হইয়া পরস্পরের জীবনকে স্বার্থক করিতে না পারিয়া, চিরদুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিব। আজ আমার মনের আঁধার ঘুচিয়াছে—আজ আমি বুঝিয়াছি যে ভগবান আমার আত্মগ্লানিকে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া সহজে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রেমমালা বলিলেন—কেন আমি এমন কি কথা বলিয়াছি যে তোমার এত আনন্দ হইল? বিনয়ভূষণ বলিলেন দেখ সে সকল কথা বুঝাইতে অনেক সময় লাগিবে আজ আর না—এস আমরা ঘুমাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ।

ক্রমে পূর্ব্বদিক লোহিত রাগে রঞ্জিত হইল। বিশ্বপাতা জীবজগতের কোন বিশেষ অপরাধের দণ্ড বিধানের জন্যই যেন জগতের এক প্রান্তে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছেন, যেন মুহূর্ত্ত কাল পরে সমগ্র বিশ্ব অগ্নিময় হইবে তাহার আয়োজন

হইতেছে—প্রকৃতি এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল—ক্ষণকাল পূর্ব্বে তমসাও নিস্তব্ধতা পৃথিবীকে এমন আচ্ছন্ন ক'রয়া রাখিয়াছিল যে তখন কেহ দেখিলে মনে করিত যে বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইয়াছে, এই অসংখ্য প্রাণীমণ্ডলী, পর্ব্বত ও নদী বৃক্ষ ও লতা, সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্র সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ড বুঝি বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, অথবা যেন কোন দস্যু ইহার মনোহারিত্বে মগ্ন হইয়া ইহাকে অপহরণ করিয়াছে—ক্ষণ কাল পূর্ব্বে এমন হইয়াছিল যেন দিন মণি আর বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণে আপনার কিরণজাল বিস্তার করিয়া প্রকৃতি প্রসূত বহুবিধ নয়ন রঞ্জন রঙ্গে জগৎকে রঞ্জিত করিবে না—তাহার বালকিরণ হিল্লোলে জগৎ আর ভাসিবে না—মানব আর সে মধুর দৃশ্য দেখিবে না—বৃক্ষ ও লতাকুল যেন আর তাহাদের হরিৎবর্ণ পত্রালঙ্কৃত দেহ জগৎকে দেখাইবে না—নব কিরণকুমারের করস্পর্শে আর যেন বিকম্পিত হইবে না—তাহারা ঠিক যেন সে আশায় নিরাশ হইয়াই নতমস্তকে অশ্রুপাত করিতেছে—তাহাদের নয়নাসারে দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। মহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে প্রকৃতির এমনই অবস্থা ছিল বটে, কিন্তু এ অস্বাভাবিক ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। ক্ষণকাল মধ্যে পূর্ব্বগগন প্রাতঃসূর্য্যের নবকিরণমালায় শোভিত হইল—মেঘ মালা যেন কোন অদৃশ্য হস্তদ্বারা স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে—তন্মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণসমূহ আপনাদের প্রভা বিস্তার করিতে না পারিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—যেন লোক চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। নিত্য দেখ বলিয়া হে পাঠক! এ

দৃশ্য যদি তোমার চিত্তকে আকৃষ্ট না করিল—তোমার মন প্রাণ যদি মুগ্ধ না হইল—যদি তোমাকে বিভুগুণগানে মত্ত না করিল—যদি তুমি ইহার ভিতর মহান্ ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট নিদর্শন না দেখিলে, তবে তোমার মানবজন্ম ধারণ করা বৃথা হইল। ইন্দ্রিয়াদির অধীন হইয়া আহার বিহারে জীবন যাপন করা পশুজীবনের কার্য্য, তাহাতে কোন গৌরব নাই—প্রকৃতির পত্রে পত্রে ভগবানের করুণা ও মহিমা দেখিয়া তাঁহার অনুগত দাস হইতে প্রয়াস পাওয়াই এ ক্ষুদ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

স্বাধীনতা প্রচারক বিহঙ্গমকুলের কলরব ও ক্রীড়াপ্রিয় সুকুমারমতি বালক বালিকার কোলাহলে ধরণী পরিপূর্ণ হইল, এক নূতন ভাব—নূতন শোভা, জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিনয়ভূষণ জাগরিত হইয়াছেন, প্রেমমালা এতক্ষণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন প্রাতের সুকোমল বায়ু-প্রবাহ যোগে নবদিবাকরের রজত কিরণজাল গৃহ প্রবেশ করিয়াছে—উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটে দাড়াইয়া বিনয়ভূষণ কি দেখিতেছেন। প্রেমমালা সত্বরপদে গৃহ-বহিস্কৃত হইতেছেন দেখিয়া বিনয়ভূষণ বলিলেন—একটু দাঁড়াও একটা কথা বলিব। প্রেমমালা একটু বুঝিতে পারিয়া বিষণ্ণ মুখে—নত মস্তকে দাড়াইলেন, বিনয়ভূষণ প্রেমমালার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ, আমি তোমাকে কি বলিব—আজ আমার বাড়ী যাবার কথা—বোধ হয় আজ যাইব। আবার এক বৎসর পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে,—না?

প্রেমমালা বলিলেন "সবইত ভাল বলিলে, তবে একটি কথা। বিনয়ভূষণ বলিলেন কোন্ কথাটি তোমার কোমল প্রাণে কাঁটার মত ফুটিয়াছে বল, আমি তাহা তুলিয়া ফেলিব। প্রেমমালা বলিলেন—আর একটি দিন থাকিলে ভাল হয় না? বিনয়ভূষণ বলিলেন—আচ্ছা আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব, তবে তোমার নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারিব না। প্রেমমালা বিনয়ভূষণের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া গেলেন, বিনয়ভূষণ অপর দিক দিয়া সদরবাটীতে গেলেন। সদর বাটীতে বৈঠকখানাঘরে তাঁহার একটি শ্যালক শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে জাগাইলেন, কালাচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন। বিনয়ভূষণ বসিবার স্থান পাইলেন। বিনয়ভূষণের শ্বশুরেরা দুই সহোদর—কনিষ্ঠের দুই কন্যা প্রেমমালা ও সুধামালা জ্যেষ্ঠের এক পুত্র কালাচাঁদ। তিনি বংশ রক্ষা করিবেন সুতরাং বংশের তিলক—আদরের ধন সত্য, কিন্তু তিনি এক অপূর্ব্ব বস্তু—লোকবিরল দ্রব্য।

কালাচাঁদের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইল। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন, এত উন্নতি করিয়াছেন যে বাগ্দেবী স্বয়ং অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন—এছেলেকে কোথায় স্থান দিবেন, ভাবিতে হইয়াছিল। অত্যধিক লেখাপড়া শিখিলে, ছেলে পাছে মারা যায় এই ভয়ে পিতামাতা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—কুল-গৌরব—বংশের বাতি—একমাত্র পুত্র অধিক বিদ্যার প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে

কালের ক্রোড় আশ্রয় করিলে, চারিদিক অন্ধকার হইবে, এই ভয়েই হউক অথবা একই পুস্তক চিরদিন পড়িতেছিলেন বলিয়াই হউক তাঁহার পড়াটা বন্ধ হইয়াছে। লেখাপড়া বন্ধ হওয়াতে তিনিও বাঁচিয়াছেন, দেবী স্বরস্বতীও বিশ্রাম লাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, কালাচাঁদের গভীর গবেষণায় তিনি নিতান্ত চিন্তাকুল, বিব্রত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয় আর কিছুদিন এরূপ অধ্যবসায় সহকারে পাঠে নিযুক্ত থাকিলে, তিনি বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় কবিরত্নের সৃষ্টি করিতেন। চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালাচাঁদ বিবাহিত হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে বিপত্নিক হন, অদ্যাপি আর সে শুভ অনুষ্ঠানের আযোজন হয় নাই। "ঈষৎ" ও "পুষ্করিণী" এই দুইটি শব্দ বানান করিতে কালাচাঁদের বিস্তৃত ললাট কুঞ্চিত হয়—যাহারা ঐরূপ বানান জিজ্ঞাসা করে তাহাদিগকে তিনি তাঁহার শত্রু বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের মুখ দেখেন না। আর ইংরাজীতে কথা বলিতে একটুও আটকায় না—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "আমি আমার মুখ ধুইয়াছি" ইংরাজীতে বলিতে হইলে কি বলিবে? কালাচাঁদ অমনি বলিবেন "I my facing washing" দুঃখের বিষয় এ ইংরাজীর বাঙ্গালা অনুবাদ আমাদের সামান্য বিদ্যায় কুলায় না। অপর কেহ অন্য প্রকার অনুবাদ বুঝাইয়া দিলে, তিনি বলিতেন ঐটি তাঁহার বড় মিষ্ট লাগে, কেমন সুন্দর যুক্তি। ছেলে দেখিতে এমন সুন্দর যে তাঁহার অশেষ গুণরাশি শরীরের সৌন্দর্য্যের অন্তরালে লুকাইয়াছে—সে রূপ বর্ণনা সামান্য লেখনীতে সম্ভব না। একদিন কালাচাঁদ পানি খাইয়াছিলেন

—অধর ওষ্ঠ সুন্দর লাল হ'য়েছিল—একজন তামাক খাবার জন্য ধরান টিকা বলিয়া টানাটানি করিয়াছিল—সেই দিন হইতে পান খাওয়া ছাড়িয়াছেন। একদিন শুভ্রবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, কে একজন তাঁহাকে বাঁধা-হুকা বলিয়া ভুল করিয়াছিল, এজন্য পরিষ্কার কাপড় পরা ছাড়িয়াছেন। বিষ্ঠা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য যখন তাঁহার চরণ স্পর্শ করে, তখনই কেবল তিনি যথাবিধি স্নান করিয়া থাকেন, এ কাল জগন্নাথের স্নান ও গড়ে বৎসরে একবার মাত্র হয়—কালাচাঁদের স্নান দেখিলে স্নান যাত্রার ফল লাভ হয়। মুখের দুর্গন্ধে যখন কেহ আর নিকটে যাইতে দেয় না, তখনই কেবল জননীর তাড়না ও তিরস্কারে ভীত হইয়া মুখের পঙ্কোদ্ধারে নিযুক্ত হন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

রজনী প্রায় দেড় প্রহর অতীত হয়। বিনয়ভূষণ সদর বাটীতে বসিয়া পাড়ার কয়েকজন যুবকের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল জামাই-বাবু বাড়ীর ভিতর আসুন। জামাইবাবু তথাস্তু বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, নবপরিচিত বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া সত্বরপদে গৃহ প্রবেশ করিলেন, পথে যাইতে যাইতে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে

কত কথাই প্রাণে উদয় হইল; ভাবিলেন—আবার নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমমালার সেই প্রেমপূর্ণ কোমল মুখখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিবেন—আবার সেই নবপরিচিতের ক্ষণপ্রভাবৎ মৃদু হাসিতে আপনার পিপাসু দৃষ্টির পরিতৃপ্তি সাধন করিবেন—আবার অন্যবিধ চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনের গতি ফিরাইয়া দিল, ভাবিলেন—কোন্ কথা আগে জিজ্ঞাসা করিবেন—কোন্ কথা বলিয়া এক বৎসরের জন্য বিদায় লইবেন—যখন তাঁহার বিদায়প্রার্থনা তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় প্রিয়তমার কোমল প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিবে—যখন তাঁহার বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া সে বিধুবদন বিষণ্ণতার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইবে—যখন তিনি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে আপনার অশ্রুপ্লাবিত মুখ খানি নিজ অঞ্চলে ঢাকিবেন, তখন তাঁহার সেই বিরস বদনখানিকে সরস করিতে—তখন তাঁহার সেই বিষণ্ণ মনকে প্রসন্ন করিতে—তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়কে সুস্থির করিতে—বিনয়ের বিনয়বচন ও শান্ত্বনাবাক্য সক্ষম হইবে কিনা, তাহা একবার চিন্তা করিলেন—যখন তাঁহার হৃদয়ের প্রেমাগ্নি—যখন তাঁহার সদ্ভাবসূচক মিষ্ট কথা—প্রেমমালার হৃদয়াকাশে উদিত বিষাদ ঘন, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিতে না পারিবে—তখন কি করিয়া সে প্রেম-পুত্তলিকে শান্ত করিবেন, তাহাও ভাবিলেন। বিনয়ভূষণ এইরূপে মর্ত্তে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতে করিতে প্রিয়তমার মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিনয়ভূষণ গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখেন তাঁহার প্রেমপ্রতিমা গৃহ আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের এক

প্রান্তে একটু আনন্দ, রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে মাত্র। বিষাদরাশি সে মুখের সকল শোভা হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে বিষাদময় মুখও ভালবাসার নিকট—প্রেমের নিকট—কেমন সুন্দর! যে দেখেছে, সেই জানে কেমন সুন্দর। বিনয়ভূষণ গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে প্রকৃতির সে হাসি খেলার ভাব—আনন্দোচ্ছ্বাসের ভাব যেন তাঁহার সহিত লুকাচুরি খেলিছে—শরতের শুভ্রকান্তি—শশিবদন সচঞ্চল মেঘখণ্ডে ঢাকিয়াছে—ধবল জ্যোৎস্না—যেন আলো আঁধারে খেলা করিতেছে—যেন এক একটি জ্যোৎস্নার তরঙ্গ আসিয়া আবার অন্ধকারের ক্রোড়ে ডুবিয়া যাইতেছে—বিনয়ভূষণ একটিবার নিবিষ্টচিত্তে সে মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিয়া বলিলেন—বা! এই যে চেহারা ফিরেছে—এ আবার কেমন ভাব। বলি, মুখস্টা খুলে ফেল—বলিতে না বলিতে আত্মহারা প্রেমমালা মনের সকল আবেগ দূরে নিক্ষেপ করিয়া একটু হাসিলেন ও প্রেমভরে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইলেন, অমনি পৌর্ণমাসী জামিনীর বিমল ভাতি প্রতিভাত হইল। বিনয়ভূষণ দেখিলেন তাঁহার গৃহ উদ্যানে প্রকৃতি কত খেলাই খেলিতেছে ও তিনি নিজে ক্রীড়াপ্রিয় বিহঙ্গের ন্যায় সেই খেলায় যোগ দিয়াছেন—সে বিহার—সে চিত্ত বিনোদন—সে আনন্দের গাঢ় মাধুর্য্য—সকলে সকল সময়ে ভোগ করিতে পায় না।

প্রেমানুরাগসম্ভূত সুখের যে পবিত্র স্রোতঃ—তজ্জনিত প্রীতি ও শান্তি যে কি সুধাপূর্ণ—কি সুখকর—কি কল্যাণকর—তাহা কে বুঝিবে? যে প্রেমিক ধর্ম্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হৃদয় প্রিয়-জনার পবিত্র আনন্দ বর্দ্ধনার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি আপনার

হৃদয়ের সদ্‌গুণ সকল একত্র করিয়া হৃদয়ান্তরের এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—যিনি সহধর্ম্মিনীর তৃপ্তি ও শান্তি বিধানের জন্য প্রেম-পরিচালিত হইয়া আত্মদান করিয়া থাকেন, তিনিই জানেন, এজগতে সাধু ব্যক্তির জন্য মঙ্গলময় বিধাতা কত স্বর্গীয় আনন্দ বিধান করিয়া রাখিয়াছেন—তিনিই জানেন বিনয়ভূষণ প্রেমের শান্তি সরোবরে ডুবিয়া কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন, সংসার-কলঙ্কে কলঙ্কিত মানব! তোমার ভাগ্য অতি মন্দ, কারণ তুমি নিজেই তোমার সুখ শান্তির পথে কাঁটা দিয়াছ। তোমার কদাচারই তোমাকে এ পবিত্র সুখে চির-বঞ্চিত রাখিল। এখনও যত্নবান হও—এখনও মনের গতি ফিরাও, অমৃত পানে অধিকারী হইবে। যে আনন্দের বিমল-স্রোতে বিনয়-হৃদয় প্লাবিত—যাহাতে প্রেমমালার তরুণ হৃদয় ভাসিতেছে—যাহার ভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আজ সেই ক্ষুদ্র তরুণী—কামিনী-হৃদয় কাঁপিতেছে—সে আনন্দ ও প্রেম-কম্পন কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

আজ প্রেমমালা বিনয়ের নিকট অপরিচিতা নহেন। অপরিচিতা নহেন সত্য—তিনি বিনয়-হৃদয় অধিকার করিয়া-ছেন সত্য—আজ তাঁহার তৃষ্ণাতুর নয়নদ্বয় বিনয়ের সরল ও সুন্দর ছবি খানি দেখিতে ব্যগ্র হইলেও—প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ দ্বারা তিনি স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে প্রিয় জনের অদর্শনে প্রাণ কাতর হইবে—কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবেন—যাঁহার মনের অশান্তি ও শরীরের অসুস্থতায় তিনিই সেবিকা—সেই স্বামীর নিকটে থাকিয়া, সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে পাইবেন না—হৃদয়ের

প্রীতি, মুখের কথা, হাতের কাজ দিয়া তাঁহার সুখ সম্পাদনে তিনি অবকাশ পাইবেন না—রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, তাঁহার চিত্তরঞ্জন স্বামীধন কোথায় যাইবেন—আর তিনি কোথায় থাকিবেন এ চিন্তা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে—স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তথাপি তাঁহার অধর ওষ্ঠ বিমুক্ত হইল না—জিহ্বার জড়তা আরও বৃদ্ধি হইল—, মনের ভাব প্রকাশ করিতে কণ্ঠ নিষ্ঠুরাচরণ করিল—তাঁহার প্রাণের কথা প্রাণেই রহিল—কণ্ঠ অচঞ্চল, জিহ্বা নির্ব্বাক অধর ওষ্ঠ পরস্পরে সংলগ্ন, কিন্তু প্রেমময়ীর চক্ষু প্রান্তে যে লীলা-লহরী উঠিয়াছে, তাহা ত আর গোপন করিয়া রাখিবার উপায় নাই—বিনয়ের চক্ষে প্রেমমালার সজল চক্ষু নিপতিত হইল—তাঁহার কোমল পল্লবাবৃত নয়নের নতদৃষ্টি বিনয়ের চক্ষে পড়িল—ভাষাবর্জ্জিত প্রাণের এক অদৃশ্য আহ্বানে আহূত হইয়া বিনয়ভূষণ শয্যাতে উপবেশন করিলেন। বিনয়ভূষণ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণে প্রিয়তমাকে বলিলেন, "কেন এত ব্যাকুল হইয়াছ? তোমার ক্লেশ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, এত শীঘ্র তোমার সহিত আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল, কারণ তাহা হইলে তোমাকে এত অসুখী দেখিতে হইত না—তোমার এরূপ অধৈর্য্য আমার উন্নতির পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত জন্মাইবে।"

প্রেমমালা সজল নয়নে—ভগ্ন স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে আবার কবে দেখিব ভাবিয়া, মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে! তোমাকে যে এতদিন দেখি নাই—পাই নাই—তোমাকে আমার বলিয়া পূর্ব্বে জানিতাম না—তাতে

আমার মন চঞ্চল হইত না—আমার কোন ক্লেশ ছিল না—এখন তুমি যে আমাব প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে—আমি যে দিবানিশি তোমারই চিন্তা করিব, এটা কি তুমি বুঝ না—সেই জন্যই আমাব প্রাণ অস্থির হইয়াছে।"

কথা গুলি তীক্ষ্ণ বাণেব ন্যায় বিনযের হৃদয় বিদ্ধ করিল—তিনি কাতর ভাবে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে আমি এখন আসিয়া তোমার নিশ্চিন্ত মনে চিন্তার উদয় করিয়াছি—কিশোবীব সরল চিন্তার ভিতরে যৌবনেব জটিলভাব—আবেগপূর্ণ চিন্তা-স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছি। তাই বলিয়াই কি এত অধীব হইতে হয়?"

প্রেমমালা বলিলেন,—"বেশ তুমি ত বড় মজার লোক! একটা লোকের ঘরখানি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—আর তাহাকে উপদেশ দিতেছ, 'তাই বলিয়াই কি এত অধীর হইতে হয়?' এ বেশ"

দশম পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

বিনয়। তুমি বল দেখি কাল রাত্রিতে যে সকল কথা হয়েছিল তাহা তোমার স্মরণ আছে কি না—শেষ কথাটি কি বল দেখি?

প্রেম। তুমি বুঝি মনে করেছ আমি সব ভুলেছি—

সকল কথাই আমি মনে করে রেখেছি। কাল সবশেষে তুমিত আমাকে বলিলে, "আমাকে দেখে তোমার বড আনন্দ হয়েছে" আমি বলিলাম, "কেন আমি এমন কি কথা বলিয়াছি যে তোমার এত আনন্দ হইল?" তুমি বলিলে "দেখ সে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে অনেক সময় লাগিবে, আজ আর না।"

বিনয়। বল দেখি আমার বন্ধুরা যদি তোমাকে দেখিতে—তোমার সহিত আলাপ করিতে চাহেন, তা হলে তুমি কি আলাপ কর?

প্রেম। তোমার বন্ধুরা ত আমারও বন্ধু। তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে কেন পারিব না?

বিনয়। আচ্ছা বল দেখি—আমি যদি তোমাকে কোন অন্যায় কাজ করিতে বলি, তবে তুমি কি কর?

প্রেম। আমি যদি সে কাজকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহ'লে তোমাকে সে কাজ করিতে দিব না, নিজেও করিব না।

বিনয়। আমি যদি তোমার কথা না শুনিয়া, তোমাকে আমার কথামত কাজ করিতে বলি, তাহ'লে তুমি কি কর?

প্রেম। মানুষের সাধু চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা সাধু হইলে, অবশ্যই তাহা সফল হইবে। আর যদি দেখি নিতান্তই তোমার অসাধু ইচ্ছার নিকট আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা পরাজয় মানিল, আমি তখন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট তোমার ইচ্ছার পরিবর্ত্তনের জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা

করিব। শুনেছি শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলে, সকল বাধাই কাটিয়া যায়।

বিনয়ভূষণ বলিলেন, "প্রেমমালা তুমি বেশ—তুমি বড় ভাল মানুষ—আমি তোমাকে কোথায় রাখিয়া তৃপ্তি লাভ করিব? আমি কাল যাব—তোমাকে একটি বিষয়ে পরামর্শ দিতেছি, তুমি সেইটি স্মরণ রাখিবে, আর সেই মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে:—সত্যের অনুরোধ ভিন্ন অন্য কারণে কাহারও অপ্রিয় হইও না—লোক অন্যায়রূপে তোমার কিম্বা তোমার কোন আত্মীয়ের অথবা অপর কাহারও কোন নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সহজে তাহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাইবে, কিন্তু বিরক্তি ও বিসদৃশ ভাব দেখাইয়া কাহারও অপ্রিয় হইও না,—নিজের বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রশংসা পাইলে নিজেদের গৌরব ভাবিয়া স্ফীত হইও না, ঐরূপ প্রশংসা শুনিলে তোমার দ্বারা কর্তব্য পালন হইতেছে, ইহা স্মরণ করিয়া সুখী হইবে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে—কিন্তু এমন ভাবে প্রশংসার ভিখারী হইও না, যাহাতে অহঙ্কার মাথা তুলিতে পারিবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। একান্ত মনে এক দিকে যেমন লেখা পড়া শিখিবে, অপর দিকে যেন গৃহকার্য্যে সেইরূপ দৃষ্টি থাকে। আজকাল লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিতেছে, যে স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত বিষময় ফল প্রসব করে। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা লাভ করিয়া শেষে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন। সাবধান এরূপ কুশিক্ষা যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। ভাষা শিক্ষা যে প্রকৃত শিক্ষা

নহে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—ভাষা, সুশিক্ষা লাভের সহায মাত্র। গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যও ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিযাছেন বলিয়া যদি রন্ধনশালায় যাইতে লজ্জা বোধ করেন—সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শ্রমের কার্য্য সম্পন্ন করা পাচক পাচিকা ও দাস দাসীর কার্য্য বোধে, ঘৃণার সহিত তাহা হইতে দূরে থাকেন—আপনাদের সন্তানাদি লালন পালনে যদি ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন—কথায় কথায় মুখভঙ্গি করিয়া মনের গরিমা ও আত্ম-প্রাধান্যের পরিচয় দেন, তবে তাঁহাদের অপেক্ষা কুসংস্কারাপন্না, অশিক্ষিতা মেয়েরা শত গুণে—সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। তোমার সেই শিক্ষার প্রশংসা করির, যাহার গুণে লোকের দোষভাগ ত্যাগ করিয়া, গুণের ভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে—যাহার গুণে গৃহকর্ম্মে শৃঙ্খলা ও পরিবারে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি হইবে—আমার বিশ্বাস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান। শিক্ষা প্রত্যেককেই দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু যাহাতে সেই শিক্ষা পাত্রদোষে বিষময় ফল প্রসব না করে, সে জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রেম। "আমি অল্প একটু আদটু লেখাপড়া যাহা শিখিয়াছি, তাহাতে আমার কিরূপ চলা আবশ্যক, তাহা আমাকে কেন বল না?

বিনয়। আমাদের মত লোকের স্ত্রীর এরূপ শিক্ষা পাওয়া চাই, যাহাতে সংসারের অবশ্য প্রয়োজনীয় অভাব দূর করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে। "আমার এটা হইল না, ও জিনিসটা না হ'লেই নয়" এমন ভাবে দুরাকাঙ্ক্ষার

অধীন হইয়া সর্ব্বদা অশান্ত প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া ভাল নহে। সংসার মধ্যে যে কোন রূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, অটল ভাবে তাহাতেই স্থির থাকা কর্ত্তব্য—সুখে মত্ত ও দুঃখে অস্থির না হইয়া, ধীরে ধীরে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করাই সুশিক্ষিত লোকের কর্ম্ম। আমি আমার স্ত্রীর জীবনে সেই শিক্ষার শোভা দেখিতে চাই, যাহার প্রভাবে নারীজীবনের কোমল ভাব সকলকে ভাল করিয়া ফুটায়—যে শিক্ষার সংস্পর্শ স্ত্রীহৃদয়ের লজ্জা, ক্ষমা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলিকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়—যে শিক্ষার সদৃষ্টান্তে পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি হয়—গৃহকে প্রেমের আলয় করে—যে শিক্ষাগুণে পরিবারের সকলেই লোকসেবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক থাকেন—আমি আমার গৃহে সেইরূপ শিক্ষার সুবিস্তার দেখিতে চাই। যখন দেখিব আমার হৃদয়ের সান্ত্বনার ধন—প্রিয়তমা, আমার রুচি ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আমার বাসনাকে চরিতার্থ করিয়াছেন, তখন আমি আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান লোক এ সংসারে কাহাকেও দেখিব কিনা সন্দেহ। আমি গৃহকে তপোবন, গৃহী ও গৃহিণীকে সবল, বিনয়ী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষি ও ঋষিপত্নী ও তাঁহাদের সন্তান গুলিকে শান্তি ও সরলতার প্রতিমারূপে দেখিতে চাই—তপোবন, ঋষি ও ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার ও ঋষিকুমারী এসকল চিরদিন বনভূমির নিবিড় হৃদয়ে লুক্কাইত রহিয়াছে, ইহাই আমার প্রাণের ক্ষোভ। আমার ইচ্ছা—গৃহে গৃহে ঐ দেবোপম পারিবারিক চিত্র চিত্রিত হয়।

প্রেমমালা এতক্ষণ আনন্দ, উৎসাহ ও ভয় বিজড়িত এক

অপূর্ব্ব ভাবে মগ্ন হইয়া অনিমেষ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন, এক্ষণে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—তোমার উপদেশপূর্ণ মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাছে আমার দ্বারা তোমার আশাপূর্ণ না হয়, এই ভাবিয়া বড় ভয় হইতেছে—ভগবান কি দয়া করিয়া আমাকে তোমার উপযুক্ত করিবেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পত্রাদি।

জল যেমন নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হয়, অনন্ত কালস্রোতঃ সেই রূপ প্রবলবেগে ভবিষ্যতের অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে—অন্য কোন কর্ম্ম নাই—দিবা নিশি—অনুক্ষণ—ভবিষ্যতের আঁধারে, বর্ত্তমানের আলো জ্বালিয়া দিতেছে—তুমি দেখ আর না দেখ, সে তাহার কার্য্যটি অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতেছে। সময় কাহারও হাত ধরা নহে, ঐ পরমুহূর্ত্তটিকে ডাকিয়া বর্ত্তমানের ক্রোড়ে বসাইয়া, কেমন নয়ন মন প্রীতিকর এক অমূল্য ফুলের মালা গাঁথিতেছে—অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান, ভুতের সহিত ভবিষ্যতের মিলন সাধন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ভূষণের সেই দিন আসিল যে দিন তিনি শুনিলেন যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার আশা না করিলেও তিনি তৃতীয়বিভাগে এল এ পাস করিয়াছেন; এই

সংবাদে তিনি আশাতীত ফল লাভ করিয়া আনন্দ রাখিবার আর স্থান পাইলেন না সত্য, কিন্তু গৃহে যে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়াছে বিনয়ভূষণের শান্তিপূর্ণ মনকে তাহা বিচলিত করিয়াছে—বিনয় ভূষণের উৎসাহ ও উদ্যম ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে—যতই জননী ও ভগ্নীর প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাঁহার শান্তিপ্রিয় হৃদয় অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইতেছে। শেষে একদিন, এক খানি পত্র আসিল, তাহাতে অবগত হইলেন যে জেষ্ঠভ্রাতা, ভগ্নী ও জননীকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। একান্নে রাখিয়া দুইটি বিধবার ভরণ পোষণের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। এরূপ না করিলে, পাছে বিনয়ের জননী পুত্রবধূকে গৃহে আনেন এবং এইরূপে তিন জনের ভরণ পোষণে বিনয়ের বিবাহোপলক্ষে প্রাপ্ত টাকা গুলি ব্যয় হইয়া যায়। এইরূপ নীচ সংসারবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া হৃদয়ভূষণ তাঁহার বিমাতা ও ভগ্নীকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া, হৃদয়ভূষণ ও তাঁহার স্ত্রীর বাক্যগঞ্জনাতে মর্ম্মাহত হইয়া, মনের দুঃখে দিন যাপন করিতেছেন। কোন দিন অন্নের উপর ব্যঞ্জন জুটে—কোন দিন ভাত কেবল নুন দিয়া উদরস্থ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায়, দুঃখের দিন গুলি একটি একটি করিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে একদিন এমন ঘটিল যে বৃদ্ধার হাতে একটি পয়সা নাই—ঘরে চাউল নাই—সে দিন হৃদয়ভূষণ সাহায্য না করিলে, হয় বৃদ্ধাকে ভিক্ষা করিতে হয়, আর তা না হ'লে সে দিন উপবাস করিতে হয়। পূর্ব্বে এমন সময় গিয়াছে

—যখন তিনি ঘোষ মহাশয়ের গৃহিণী বলিয়া গ্রামের সর্ব্বত্র আদর ও সম্মানের পাত্রী ছিলেন, আজ কেমন করিয়া প্রতিবেশীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন? লজ্জা ও অভিমান আসিয়া তাঁহাদের সাহয্য প্রার্থনার পথ বন্ধ করিল, তাঁহারা সে দিনউপবাস করিলেন। বিনয়ভূষণ বাড়ীর দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া শরতের নিটক ৫৲ টাকা ঋণ করিয়া মার খরচের জন্য পাঠাইয়াছেন। পরদিন প্রাতে ডাকের চিঠি পাইলেন, তাহাতে ঐ পাঁচটি টাকা পাইয়া সে দিন উপবাসের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। ভগবান দয়া করিয়া দুঃখীর দুঃখ পীড়িতের আর্ত্তনাদ শুনিয়া থাকেন, তাই আর দ্বিতীয় দিন তাঁহাদিগকে উপবাস করিতে হইল না।

পত্রোত্তরে বিনয়ভূষণ শুনিলেন যে মাতা ও ভগ্নীকে অর্থাভাবে উপবাস ও তাহার উপর বাক্যগঞ্জনা ভোগ করিতে হইতেছে, তখন তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বন অসম্ভব হইল। তিনি গৃহে আসিয়া বিষয় সম্পত্তি অংশ করিয়া লইবেন, মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। হৃদয়ভূষণ তাহা বুঝিতে পারিযা পূর্ব্ব হইতে সে চেষ্টার পথ বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন, এমন বন্দবস্ত করিতেছেন, যাহাতে বিনয়ভূষণ সহজে সম্পত্তি অংশ করিয়া লইতে না পারেন। সুখে দুঃখে—সম্পদে বিপদে—ইহলোকে পরলোকে যিনি সমভাবে তাঁহার ভাগ্যে ভাগ্য মিলাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—আশায় আশা-স্রোতঃ মিলাইয়াছেন,—জীবনে জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন—সেই জীবন-তোষিণীকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে যে কেবল পাসের সংবাদ দিলেন তাহা নহে। সকল সংবাদ কিছু কিছু দিলেন।

প্রেমমালা এ পর্য্যন্ত কোন সূত্রে বিনয়ের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এত দিন তিনি পিতৃগৃহে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন—কোথা হইতে এক জন লোক—পরের ছেলে আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া গেল—তাঁহার হৃদয়ে কি অমৃত ঢালিয়া দিল—কি প্রেম বন্ধনে বাঁধিল, যে তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। একদিন প্রেমমালা আপনা আপনি বলিতেছেন :—"আমার এমন দশা কে করিল রে।"

এমন সময়ে সহসা একখানি পত্র পাইলেন। তাঁহার জীবনে—আর কখন কাহারও নিকট হইতে পত্র পান নাই। পত্র পাওয়াটা যে কি তাহা এই নূতন শিখিলেন। পত্রখানি পাইয়া অনিমেষ নয়নে নিজের নামটি—সেই ভালবাসার হাতে লেখা নামটি এক বার—দুই বার—তিনবার পড়িলেন—পড়িতে পড়িতে মন এমনি মজিয়াছে যে পত্রটা খুলিযা পড়িতে ভুলিযা গিয়াছেন। তাঁহার মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, সব খবর ভাল ত? প্রেমমালা একটু অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিলেন ও আস্তে আস্তে বলিলেন—মা, আমি এখনও পড়ি নাই। মা মেয়েকে অপ্রতিভ দেখিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

প্রেমমালা পত্র পড়িতে লাগিলেন:—

প্রিয়তমে!

তোমাকে না বলিয়া আমি তোমার প্রেমভরা মুখ খানি, চুরি করিয়া আনিয়াছি। আসিবার সময়ে ভাবিলাম—একটা কিছু না নিয়ে গেলে, কি ক'রে থাক্‌ব—তাই এই অপকর্ম্মটি

.... লোকে বলে "চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই," তা এখানেও দেখি তাই। আমি আমার প্রয়োজন মত, একটা কিছু আনিলাম সত্য, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে দেখি, আমারও যেন কি একটা চুরি গিয়াছে—অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে ধরিলাম, আমার কি হারাইয়াছে। আমার কি হারাইয়াছে, তাহা কি বলিব? না—বলিব না—সংসারের নিয়ম এই যে, হারিলে কিম্বা ঠকিলে, প্রকাশ করে না—তবে আমি কেন প্রকাশ করিব? প্রকাশ করিবই না বা কেন? আমার ত ব্যবসাদারী নহে—ভালবাসার নিকট পরাজিত হইয়া—প্রেমের হাতে নাস্তানাবুদ হইয়া যে কি সুখ, তা কি সকলে বুঝে? আমি আসিবার সময়ে তোমার অমিয়মাখা মুখখানি চুরি করিয়া আনিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার শুষ্ক ও কঠোর প্রাণ, যাহা তোমার প্রেম-সংস্পর্শে কোমল ও সরল হইয়াছে, এই হত-ভাগার সেই প্রাণটি হারাইয়া আসিয়াছি। তুমি পত্র পাঠ মাত্র আমাকে লিখিও, সেটি তোমার নিকট আছে কি না, যদি থাকে ভালই—যত্ন করিয়া রাখিও—তোমার নিকট না থাকিলে, আমাকে আবার অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে। সত্বর সংবাদ দিবে।

সংবাদটা তোমাকেই দিই—আমি এবার এল্‌. এ. পাস করিয়াছি। আমার আশা ছিল না, তবে আমরা যেখানে নিরাশ, ভগবান কৃপা করিয়া সেখানে আশার সঞ্চার করেন। তোমার ভালবাসা স্মরণ করিতে আমার প্রাণ মন সতত আরাম পায় সত্য—আমি এবার আশা না করিয়াও পরী-ক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছি সত্য—কিন্তু আমার একটি গুরুতর

বিপদের সূত্রপাত হইতেছে—জানি না, সে বিপদ আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে। একবার মাত্র তোমার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে মিলিত হইয়াছি—এ জনমে আর কখন এমন অক্ষুণ্ণ মনে মিলিতে পাইব কি না জানি না। সত্বর তোমার কুশল লিখিয়া আমার চিন্তা দূর করিবে। আমি তোমার পত্রের জন্য পথ তাকাইয়া রহিলাম। শীঘ্র বোধহয় স্থানান্তরে যাইব।

তোমারই বিনয়ভূষণ।

পত্র পাঠে প্রেমমালা একটু চিন্তিতা হইলেন—আবার পড়িলেন, আবার গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন—এমন সময়ে ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল দিদিমণি। জামাই বাবুর খবর ভাল ত? তিনি কেমন আছেন? প্রেমমালা চমকিত হইলেন—ভাবিলেন আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহা কি কেহ জানিতে পারিল—অমনি আবার আত্ম সম্বরণ করিয়া বলিলেন—একজামিন্ পাস করা হ'য়েছে—আর বিশেষ কোন মন্দ খবর নাই। ঝি বলিল, "কোন অসুখ নাই ত?" প্রেমমালা বলিলেন, "না, ভাল আছেন। ইত্যবসরে কর্ত্তা বিনয়ের এক পত্র পাইয়া বিনয়ের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াছেন, বাড়ীর ভিতর আসিয়া গৃহিণীকে সমস্ত কথা বলিলেন। জামাইয়ের পাসের সংবাদ পাইয়া বাটীর সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রেমমালার আনন্দভরা মুখের এক পার্শ্বে একটু দুর্ভাবনার কাল মেঘ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত চিত্ত। তিনি ভাবিতেছেন "গুরুতর বিপদ" কি, আর "অক্ষুণ্ণ মনে" মিলিতে পাইবেন নাই বা কেন? আমি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া

তাঁহার সেবা করিলেও কি তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিবে না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে দিন কাটিল। পর দিন অতি শান্তভাবে বসিয়া এক খানি পত্র লিখিলেন। পত্র খানি লিখিয়া একবার—দুইবার—তিন বার পড়িলেন। পড়িয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের সব কষ্ট কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তখন পত্র খানি খামে পুরিয়া, ঠিকানা লিখিয়া, দাসী দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন।

যথা সময়ে পত্র খানি বিনয়ভূষণের হস্তগত হইল। বিনয়-ভূষণ পত্র খানি পাইয়া, একটিবার তাহার চারিদিক বেশ করিয়া দেখিলেন, দেখিলেন কেহ খুলে নাই—দেখিলেন প্রেমমালার হাতের লেখা বটে—দেখিলেন লেখাটি বড় সুন্দর—ভাবিলেন—ভিতরে কত কথাই লেখা আছে—আর কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র খুলিলেন—

প্রাণাধিক।

তোমাকে কি কথায় সম্বোধন করিলে, মনের ভাবটি ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহা জানি না। তবে তুমি যে প্রাণের অধিক প্রিয় তাহা বেশ বুঝিতে পারি। আমি তোমার প্রাণ মন চুরি করিয়া রাখিয়াছি কি না, তাহাও জানি না, তবে তুমি যদি মনে কর আমি চুরি করিয়াছি—তবে সে আমার পরম সৌভাগ্য—কি করিয়া লোকের মন চুরি করিতে হয়—সে কৌশলও জানি না—তবে অনুরাগে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ, তোমাতে আকৃষ্ট বলিয়া আমার প্রাণের আশা পূর্ণ হইয়াছে। আমার মুখখানি তোমার এত ভাল লাগিয়াছে, যে তুমি আমাকে না বলিয়া তাহা লইয়া গিয়াছ—এ কথায় আমি কি

উত্তর দিব, তাহাও জানি না,—আমি নিতান্ত ভাগ্যবতী। তোমার পাসের সংবাদে আমি যে কি সুখ অনুভব করিলাম তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার উন্নতিই আমার নিত্য কামনা। তুমি যে বিপদের কথা লিখিয়াছ সে বিপদ কি, জানিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত আছি—দয়া করিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া লিখিবে—আর একটি কথা এই যে, আমি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, তোমার সেবা করিলেও কি তুমি অক্ষুণ্ণ মনে এ হতভাগিনীকে গ্রহণ করিতে পারিবে না? আমি তোমার এই শেষ কথাটিতে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি—তোমার অক্ষুণ্ণ তৃপ্তির জন্য, তুমি আমাকে যাহা বলিবে, তাহাই করিব। তোমার সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করাই যেন আমার প্রধান ব্রত হয়, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে এমন সামর্থ দিন। তোমারই প্রেমমালা।

বিনয়ভূষণ অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রেমমালার সরলতা—সেবার ভাব ও বিনয় দেখিয়া বিনয়ভূষণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আমি এই পারিবারিক অশান্তির মধ্যে—এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে—এই অর্থাভাবের মধ্যে, যদি এমন সৎস্বভাব-সম্পন্না স্ত্রী না পাই-তাম—যদি দৈব দুর্বিপাক বশতঃ আমাকে কটুভাষিণী ও প্রগল্‌ভা স্ত্রীর হাতে পড়িতে হইত, তাহা হইলে আমার এই সকল বাহিরের অশান্তি ও দুঃখ কষ্ট শত সহস্র গুণে বাড়া-ইয়া দিত। আহা! কি মিষ্ট কথা—কি সুন্দর আনুগত্যের ভাব!—যে নিয়ত আমার সুখ ও শান্তি কামনা করে, আমি তাহাকে সুখ ও শান্তিতে রাখিতে পারিব না, এই আমার বড়

দুঃখ। আমি কি করিয়া দাদার নিষ্ঠুর ব্যবহার, জননী ও বিধবা ভগ্নীর চক্ষের জল ও আমাদের অন্ন কষ্টের কথা লিখিয়া, সেই সরলপ্রাণা বালিকার কোমল মনে, দুঃখ কষ্টের আগুণ জ্বালিয়া দিব? অনেক চিন্তার পর প্রেমমালাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া লেখাই স্থির করিলেন। গৃহে গমন করিলেন—বাড়ীতে বসিয়া দাদার সহিত বিবাদ করিয়া কোন ফল নাই—তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। বিনয়ের দাদা, বিনয়ভূষণের বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই, জননী ও ভগ্নীকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। বিনয়ের বিবাহে যে টাকা গুলি পাইয়াছিলেন, সে গুলি সমস্তই হস্তগত করিয়াছেন—অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া প্রার্থনা করাতেও এক পয়সা দিলেন না। ইহারা খাবে কি, তাহার নিশ্চয়তা নাই। বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে তাহারই সামান্য আয় দ্বারা মা ও ভগ্নীর ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিনয়ভূষণ গৃহ ত্যাগ করিলেন। প্রথমে কৃষ্ণনগর গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে প্রেমমালাকে সমস্ত কথা অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন।
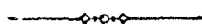
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মকাজ।

কলেজে পড়া বন্ধ হইয়াছে। তার পড়া চলিবার কোন আশা ভরসা নাই। কৃষ্ণনগরে আসিয়া শরৎচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন স্কুলে শিক্ষকতা করাই স্থির করিলেন। স্কুলে কর্ম্ম করিতে করিতে, পরীক্ষা দিবার মানস করিলেন। গোপাল বাবু ও বিনয়কে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। বিনয়ভূষণ কয়েক সপ্তাহ কেবল এডুকেসন গেজেট খুঁজিয়া বেড়ান, আর কর্ম্ম খালি দেখিলেই আবেদন পাঠান। নানা স্থানে আবেদন করিতে করিতে এক স্থানে একটি কর্ম্ম পাইলেন, কিন্তু সেস্থান তত ভাল নহে, বিশেষতঃ সে স্থানে থাকিয়া বি এ পরীক্ষার সুবিধা হইবে না। কিন্তু বসিয়া না থেকে সেই কর্ম্ম গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। পরামর্শে এইরূপ স্থির হইলে, বিনয়ভূষণ সেখানে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বিনয়ভূষণ সেই স্থানে কর্ম্ম করিতে করিতে দুই তিন বার প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। দুই এক মাস অতীত হইতে না হইতে, তাঁহার মা তাঁহাকে লিখিলেন যে, মাসে কিছু টাকা বেশী পাঠাইতে হইবে, কারণ তিনি বৌমাকে তাঁহার নিকট আনিতে চান। বউ বড় হইয়াছে, বিবাহের পর আর আনা হয় নাই, ভাল দেখায় না। বিনয়ভূষণ নিরুপায় হইয়া তাঁহার সামান্য

হইতে আপনার অসুবিধা সত্ত্বেও মাসে ১৫ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার জননী পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। প্রেমমালা বধূবেশে শাশুড়ীর ও ননদিনীর বড়ই ভালবাসা ও আদরের ধন হইয়া পড়িলেন। সংসারের দুঃখ কষ্ট লইয়া একদিন মা ও মেয়েতে কলহ হইল। কন্যা, দাদার দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া—বড় দাদার অন্যায় ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, "মা তুমিইত এই সকল অনর্থের মূল। দাদা যখন তোমার পায়ে পড়িয়া কাদাকাটি করিয়া বলিলেন, তোমরা বিলম্ব কর, আমি আর কিছুকাল পরে, এই পাত্রীকেই বিবাহ করিব, তখন কেন তাঁহার কথা শুনিলে না? আমিত ব'লেছিলাম, "দাদার বিবাহ না, সর্ব্বনাশ হইল।" মা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—ঐ হতভাগা আমার কাণে কি মন্ত্র দিলে, আমি ভাবিলাম—আমার সোনার চাঁদ ছেলে একা বিদেশে থাকে, তার বিয়ে না দিলে, খারাপ হ'য়ে যাবে। তাই ওর কথায় বিশ্বাস করে, আমার ছেলের বিবাহ দিয়াছি—আহা ছেলেটার লেখা পড়া করবার এত ইচ্ছা, তবুও বাছা, আমার লেখা পড়া কত্তে পেলে না, চাকরি কত্তে যেতে হ'লো। আমাদের জন্যই তার সর্ব্বনাশ হ'লো। মনো! মা তুই ঠিক বলিছিস্—আমি আর তোকে কিছু বলব না, আমারই দোষ।

প্রেমমালা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বিবাহের সময় সে গৃহে কি কাণ্ড হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন তিনিই পরোক্ষভাবে এই সকল অশান্তির কারণ—সুতরাং আরও সাবধান

হইয়া চলিতে লাগিলেন। নানা প্রকার অশান্তি সত্ত্বেও তাঁহার উপর কেহই বিরক্ত নহেন—সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। প্রেমমালা বধূবেশে সকল প্রকার স্বাধীন ভাব বর্জ্জন করিয়া পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় খান্ দান্ থাকেন—মনে কোন সুখ নাই—একমাত্র সুখ—সর্ব্বদা স্বামীর পত্রাদি পাইয়া থাকেন এবং অল্প দিন পরে তাঁহার নয়ন-মন-রঞ্জন স্বামীধনকে নিকটে পাইবেন। আশায় বুক বাধিয়া সকল প্রকার মনমালিন্য দূর করিয়া দেন—তাঁহার ননদিনীই তাঁহার প্রধান সহচরী—সকল কর্ম্মে ননদিনী তাঁহার—তিনিও ননদিনীর।

বিনয়ভূষণ যে স্থানে কর্ম্ম করেন সে স্থানটি বড়ই অস্বাস্থ্যকর, তাতে বর্ষার সময়ে তিনি সে স্থানে নূতন লোক—জ্বরে পড়িলেন। একবার দুইবার—ক্রমান্বয়ে তিন চারিবার জ্বর হইল, শরীর ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার প্রজারা সকলেই তাঁহার দাদার বশীভূত—এক পয়সা খাজনা দেয় না। একবার বড়ী যাওয়া আবশ্যক। পূজার বন্ধ সম্মুখে। বিনয়ের ইচ্ছা ছিল একবার কৃষ্ণনগরে গিয়া কয়েকদিন, সেই খানে বিশ্রাম করেন, অথবা শরৎদের বাড়ীতে গিয়া একটু বেড়াইয়া আসেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না, তাঁহাকে বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, একদিন দাদা মহাশয় মাকে গালি দিয়াছেন—অনাথা বিধবা ভগ্নিকে প্রহার করিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিনয়ভূষণ গ্রামের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাঁহাদের এই পারিবারিক ও বৈষয়িক গোলযোগ মিটাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা কাহারও অপ্রিয় ভাজন হইতে চান না—অন্যায়ের প্রতি চক্ষু মুদিয়া লোকের প্রিয়ভাজন হওয়াও তাঁহারা শ্রেয় মনে করেন। বিনয়ভূষণ দেখিলেন, এমন স্থানে, এমন লোকদের ভিতর, বাস করাই কঠিন। যাহা হউক বিনয়ভূষণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, শেষে সম্পত্তির আশা ভরসা কিছু দিনের মত ত্যাগ করিলেন এবং মা ও ভগ্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি যেমন করে হউক, সংসারের ব্যয়ভার বহন করিবেন। প্রেমমালা এই সকল গোলযোগের ভিতর স্বামীর চিত্ত-বিনোদনে সর্ব্বদা যত্নবতী আছেন। তাঁহার মনে সুখ নাই—প্রাণে আনন্দ নাই, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর প্রথম পত্রে যে গুরুতর বিপদের কথা লেখা ছিল, সে কি বিপদ। বিনয়ভূষণ যখনই অবকাশ পান, তাঁহার স্ত্রীকে সদ্ভাব দেখাইতে—এই সকল দুঃখের আগুণে পড়িয়া তাঁহার প্রাণে যে যাতনা হয়, তাহার পরিমাণ কমাইতে বিধিমতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, নানাবিধ অশান্তির মধ্যে প্রেমমালা স্বামী সহবাসে কয়েকদিন সুখে দিন কাটাইলেন। পূজার অবকাশ শেষ হইয়া আসিলপ্রায়, এমন সময়ে বিনয়ভূষণ স্থির করিলেন, যে তাঁহার আর ঐ কর্ম্মস্থানে যাওয়া ঠিক নহে, কিন্তু নিজে কর্ম্মটি পরিত্যাগ না করিয়া, একবার গোপাল বাবুকে ও শরৎকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। শ্বশুরের অনুরোধে, প্রেমমালাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, দুই তিন দিনের মধ্যে একবার কৃষ্ণনগর গেলেন। তথায় গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ

হইল। শরৎ বাড়ী গিয়াছেন। গোপাল বাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এমন অবস্থায় আর সেখানে না যাওয়াই ভাল।" বিনয়ভূষণ বলিলেন, "একবার কলেজের তারাপ্রসাদ বাবুর সহিত দেখা করিয়া সমস্ত বলিলে ভাল হইত। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, একবার তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত।" গোপাল বাবু—বলিলেন সেকথা মন্দ নহে, চল একবার দুই জনেই যাই—দেখি তিনি কি বলেন।

তারাপ্রসাদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলে পর, তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন— এমন কত শিক্ষালোলুপ যুবক যে সংসারভাবে ভগ্নোদ্দম হইয়া নিরাশায় ডুবিয়া যাইতেছে,—তাহার সংখ্যা নাই। তবুও ত লোকের চৈতন্য হইতেছে না। বিনয়ভূষণ,—তোমার ইচ্ছা কি? কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করিতে তোমার ইচ্ছা থাকিলে আমাকে বল, আমি তোমার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে পারি। কলিকাতায় কোন কোম্ আফিসে আমার বিশেষ বন্ধু, দুই এক জন আছেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দুই এক জনের কর্ম্ম কাজ করিয়া দিয়া থাকেন। তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে, বোধহয় অল্প দিনের মধ্যে একটি কর্ম্মকাজ হইতে পারে। কি বল, যাবে কি? বিনয়ভূষণ বলিলেন—আমার পড়া শুনাটি বন্ধ হবে, এই বড় দুঃখ। শিক্ষাবিভাগে কোথাও কিছু হয় না? তারাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—আচ্ছা আমি তোমাকে দুই তিন খানি পত্র দিতেছি— লইয়া যাও, যেখানে সুবিধা হয় চেষ্টা দেখিবে। বিনয়ভূষণ পত্র গুলি লইয়া আসিলেন, পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া, গোপাল বাবুর এক আত্মীয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিভাগের একজন অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তারাপ্রসাদ বাবুর পত্র খানি দিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "আমার হাতে আপাততঃ কিছু নাই—অল্প কয়েকদিন হইল একটি স্কুল-সব-ইন্‌স্‌পেক্টরী খালি ছিল—একজনকে দিয়াছি তোমার নাম রেজিষ্টারি করিয়া রাখিলাম, সুবিধা হইলেই তোমাকে দিব—আর তারাপ্রসাদ বাবুকে আমি লিখিব, যে তোমার সম্বন্ধে চেষ্টা করিতে আমার ত্রুটি হইবে না; তবে একটু সময় লাগিবে।" বিনয়ভূষণ এক এক করিয়া সকলের নিকট গেলেন; কোথাও কিছু হইল না—তবে সর্ব্বশেষে যেখানে গেলেন, সেখানকার কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন, "আর দুই এক মাস পরে আমার এখানে কয়েকটি কর্ম্ম খালি হইবে—তুমি যদি এই দুই মাসকাল আমার আপিসে বিনা বেতনে বাহির হইতে পার, তবে আমি সেই সময়ে তোমাকে একটি কর্ম্ম দিতে পারি।" বিনয়ভূষণ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতেই সেই অপিসে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

বিনয়ভূষণ যখন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। সময়ে সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেও তিনি স্বাভাবিক বেশ হৃষ্টপুষ্ট--বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ—কিন্তু বিনা বেতনে দুই মাস সেখানে কর্ম্ম করিতে করিতে,তাঁহার শরীরের অৰ্দ্ধেক শোণিত শুষ্ক হইল। তাঁহার শরীর শীর্ণ হইবার অনেকগুলি কারণ

ছিল, তাহার মধ্যে গৃহের দুঃখ কষ্টের চিন্তা সর্ব্বপ্রধান—তাহার পর তিনি কলিকাতায় একটি ছেলেকে পড়াইয়া নিজের ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া থাকেন, দুইটি বেলা পদব্রজে যাতায়াত করিতে হয়—তাহার উপর আপিসে কাজের লোক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে অনেক অধিক ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করিতে হয়—সকলে খুব ভাল বাসেন, কারণ সকলে খুব কাজ পাইয়া থাকেন। একটি ২৫৲ কি ৩০৲ টাকা বেতনের এক কর্ম্মের আশাতে তাঁহার শরীর মনের অধিকাংশ শক্তি নিঃশেষ হইল। দুঃখ দুঃখেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, যে দুই মাস অতীত হইলে কর্ম্ম পাইবার কথা ছিল, সে দুইমাস অতীত হইল—কর্ম্ম কাজের সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে আপিসে সে সময়ে নূতন লোক নিযুক্ত হইল না। হরিষে বিষাদ—আশায় নিরাশা আসিয়া তাঁহার শরীর মনের শক্তিকে বিন্দু বিন্দু করিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ যথা সময়ে আপিসে আসেন—অনেক পরিশ্রম করেন—লোকেও তাঁহাকে ভাল বাসে—এই জন্য অল্প কয়েকদিনের জন্য একটি কর্ম্ম খালি হইবামাত্র সকলেই তাঁহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক বেতনে সে কর্ম্মতাঁহারই হইল, বিগত ২।০ মাস অপরের কাজে সাহায্য করিয়াছেন, সুতরাং বিশেষ কোন দায়িত্ব ছিল না—এক্ষণে দেখিলেন তাঁহাকে প্রতিদিন যে পরিমাণ কাজ করিতে হয়—তাহা এক জন লোকে একদিনে সম্পন্ন করিতে পারে না। যদি অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া এক দিনে সম্পন্ন করেন, তবে আর তার পরদিন তাহার অর্দ্ধেক কাজ করিবার শক্তি থাকে না। মাসাধিক কাল এইরূপে কাটিল, বিনয়ভূষণ

দেখিলেন, এরূপ ভাবে জীবন যাপন করা বড় বিপদজনক। অধিকাংশ লোক নিরুপায় হইয়া কর্তৃপক্ষদের তাড়নার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে। ফাঁকি দিয়া স্বার্থ-সাধনটা যে দোষের কাজ, অভ্যাস-দোষে তাহাদের বিবেক বুদ্ধি একথা স্মরণ করাইয়া দিতে বিরত হইয়াছে। চাকুরি করা—চাকুরি বজায় রাখাই, ইহাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে—চাকুরিই জীবন—চাকুরিই ধর্ম্মকর্ম্ম—ইহার জন্য লোক সকলই করিতেছে। বিনয়ভূষণ দেখিলেন বড় বিপদ—এখনও বিবেকটাকে গলা টিপিয়া বিদায় করিতে পারেন নাই—সুতরাং মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা আত্মকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন না—বহুপরিশ্রম দ্বারা যত দূর সম্ভব, অন্য সকলের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণে বামে যে তাঁহার বন্ধুরা কত কীর্ত্তি করিতেছেন, তাহা দেখেন কিন্তু কোথাও প্রকাশ করেন না, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন, গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীগণের অবিবেচনায় ও নিষ্ঠুরাচরণে ইহাদের ন্যায়ান্যায় বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—এক মুষ্টি অন্নের জন্য ইহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এরূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার শরীর রক্ষা ও পরিবার প্রতি-পালন সঙ্গত কিনা। রত্নাকর পরিবার প্রতিপালনের জন্য নরহত্যা করিতেন—কিন্তু পরিবারের কেহই তাঁহার পাপ-ভাবের অংশ গ্রহণে সম্মত হইলেন না দেখিয়া, তিনি আত্ম-চিন্তায় রত হন, এই চিন্তা বিনয়ভূষণের কল্পনাকে অধিকার করিল। "আমি কি করিব" এই কঠিন প্রশ্ন তাঁহার প্রাণের

উপর আঘাত করিতে লাগিল—তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন চারি মাস কাটিল। এমন সময়ে সেই কর্ম্মটি খালি হইল। বিনয়ভূষণ আর চিন্তা করিবার—পরামর্শ করিবার—ভাবিবার—অবসর পাইলেন না—তাঁহার সাংসারিক অবস্থা, তাঁহাকে সেই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। তিনি সেই ২৫৲ টাকা বেতনের কাজটি পাইলেন এবং গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুসেবা।

বেলা অবসান প্রায়, দিনমণি ম্লানমুখে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি অসংখ্য প্রাণীপুঞ্জকে ডাকিয়া বলিতেছেন—আজিকার মত বিদায় হই—সমস্ত দিন আলোক বিতরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—আর পারি না—তোমরা এখন বিশ্রাম সুখ ভোগ কর। কৃষক-বালকেরা গোপাল লইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়াছে—পরিশ্রান্ত পথিক অতিথির বেশে, কোথায় কোন্ গৃহে আশ্রয় লইবেন—ব্যস্ত হইয়া তাহারই অন্বেষণে সত্বর পদে চলিয়াছেন—ক্রমে একটু ঘোর হইয়া আসিল—একটি যুবক এক খানি নৌকায় বসিয়া আছেন, নৌকা খানি বেশ চলিয়াছে—তিনি অনিমেষ নয়নে আকাশের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছেন—তাঁহার চক্ষের উপর প্রকৃতি কত খেলাই

খেলিতেছে—দুই খানি মেঘের টুক্‌রা, দুই দিক হইতে আসিয়া লোহিত কান্তি সান্ধ্যরবিকে আক্রমণ করিল—প্রকৃতি সতী—সোহাগের বালা, অমনি হাসি হাসি মুখে বদন ঢাকিল। যুবক এতক্ষণ এক মনে, এক প্রাণে, প্রকৃতির নীরব সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণে সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—শুনিলেন কে যেন, দূরে গাহিতেছেঃ—

ঐ তোর মধুর হাসি, দেখিতে যে ভাল বাসি,
হাসাস্ কাঁদাস্ তবু, কেন তোর কাছে বসি।

গান শুনিয়া, যুবকের অবসন্ন মন আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন—অনিমেষ নয়নে নদীর নির্ম্মল বক্ষে প্রতিবিম্বিত আকাশের মনমোহন চিত্র দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—ঐ দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির হাসিভরা মুখখান যেমন রজনীর ঘন অন্ধকারে আবৃত হইল—মানব জীবনও ঠিক সেইরূপ, এক দিন মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের প্রবল প্রতাপ দেখাইয়া শেষে অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। আজ আমি যুবক—কত আশা ভরসাকে—কত সুখের চিন্তাকে—কত সদনুষ্ঠানের চিন্তাকে, প্রাণে—আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে, পোষণ করিতেছি—কিন্তু হায়, একটি দিন নিরন্তরই আমার জীবনের সম্মুখে থাকিয়া, আমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে, যে সমুদ্রের গভীর অতল জলে ডুবিলে, যেমন রত্ন লাভ হয়, ঠিক সেইরূপ গাঢ় ঘন অন্ধকারের ক্রোড়ে নির্ভয়ে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, অমরত্ব লাভ হয়—সে রত্ন চিরদিন জীবনকে মধুময় করিয়া রাখে—সে অন্ধকার মৃত্যু—সে অমরত্ব-রত্ন পরমাত্মা। ক্রমে অন্ধকারের গায়, অন্ধকার এক তিল, এক

তিল করিয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল—ক্রমে সমস্ত ধরা অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল—কেবল পশ্চিম গগণের শেষ রেখামাত্র সূর্য্যাস্তের পরিচয় দিতেছে, এমন সময়ে শরতের নৌকা খানি বিনয়ভূষণদের বাড়ীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। শরৎচন্দ্র নৌকা হইতে উঠিয়া, আর কাল বিলম্ব না করিয়া, বিনয়ভূষণদের বাড়ীতে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানও বুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি দেখিলেন, বিনয়ভূষণ সাংঘাতিক পীড়াতে অচেতন—জ্ঞান নাই—মা, ভগ্নী ও গ্রামের অপর কয়েকজন আত্মীয় নিকটে বসিয়া, তাঁহার সেবা করিতেছেন। বিনয়ভূষণকে দেখিয়াই শরৎ ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণের বন্ধু এবার আর রক্ষা পাইবেন না—সংসারের অত্যাচার—নির্দ্দয় ব্যবহার—ও শক্রতা, তাঁহার শরীর মনকে বিন্দু বিন্দু করিয়া গ্রাস করিয়াছে—এবার মাটির দেহ মাটিতে মিশিবে। শরৎ নিঃশব্দে সেই পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলেন সত্য, কিন্তু বিনয়ের অবস্থা দেখিয়া, তিনি এমন আত্মহারা হইয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষু কিছুই দেখিতেছে না—কর্ণ কিছুই শুনিতেছে না—মন কিছুই চিন্তা করিতেছে না—স্পন্দহীন জড়ের ন্যায়, সর্ব্ব কার্য্য বর্জ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রোগী প্রলাপ বলিতে বলিতে শরৎচন্দ্রকে ডাকিল—সকলে ভাবিল, তবে বুঝি এবার চেতনা হইল—কিন্তু রোগী কেবল "শরৎ, ভাই, তুমি কোথায়, একবার এস, আমাকে দেখ—আমি তোমাকে পেলে—আঃ—আমার মা, ভগ্নীকে তোমার হাতে দিয়া—আঃ—প্রেমমালা, তোমার দুঃখ।"—এই কয়টি কথা বলিয়া

নীরব ও অভিভূত হইল। শরৎচন্দ্র একটু সংযত ভাবে বিনয়ের আরও একটু নিকটে গিয়া বসিয়া, বিনয়কে ডাকিলেন। বিনয়ভূষণ নিরুত্তর।

বিনয়ের মা মনোরমাকে চুপি চুপি বলিলেন, "মা, তোমার শরৎ দাদা আসিয়াছেন, ছুটি ভাত রাঁধগে, তোমরা দুইজনে খাবে। তুমি আর জল দেওয়া ভাত খেওনা, শেষে অসুখ হবে।" শরৎ না আসিলে, মনোরমা হয়ত সেই প্রাতের পান্তা-ভাত খাইতেন। রন্ধনাদি হইলে, বিনয়ের মা একবার শরৎকে নিজে সঙ্গে লইয়া বসাইয়া দিলেন। খাবার কিছু নাই বলিয়া—বিনয়ভূষণের এই পীড়ার উল্লেখ করিয়া, কত মিষ্ট কথায় শরৎচন্দ্রকে যত্ন করিলেন ও আপনার লোক মনে করিয়া নিকটে বসিলেন; আর অমনি চক্ষের জলে বৃদ্ধা ভাসিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। মনোরমা অদূরে অবাক হইয়া, দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে বলিয়া, মনোরমা ঔষধ খাওয়া-ইতে দৌড়িলেন, বৃদ্ধা ক্ষণকাল পরে শোক সম্বরণ করিয়া শরৎকে বলিলেন "খাও বাবা, ভাত খাও; তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই।" শরৎচন্দ্র খাইতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না। তিনি আহার করিতে করিতে—বিনয়ভূষণের রোগের অবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কিরূপ হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিলেন। বৃদ্ধার সকল কথা স্মরণ নাই—মনোরমাই সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সুতরাং গৃহিণী মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র

বলিলেন, "অল্প দূরে, মনোহরগঞ্জের জমীদার বাবুদের এক ইংরেজ ডাক্তার আছেন, কিছু টাকা খরচ করিলে, সেই ডাক্তার সাহেবকে আনা যাইতে পারে, যে টাকা লাগিবে, আমি নিজে তাহা খরচ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা অনুমতি দিলে, আমি নিজে সমস্ত বন্দবস্ত করিতে পারি।" কন্যা ও মাতা একবার মুখ চাওয়াচাই করিলেন, কি উত্তর করিবেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারেন না—এমন সময়ে শরৎচন্দ্র আবার বলিলেন,"ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইলে, বিনয় আরোগ্য হইবে, বিনয় আরাম হইলে, আমার টাকা তাহার নিকট পাইব।" মনোরমা জননীকে ইঙ্গিতে বলিলেন, সেই ভাল। তখন গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমার অন্ধের ধন—এই দুটা বিধবার একমাত্র অবলম্বনকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর, চিরকাল তোমার নিকট ঋণী থাকিব।"

পরদিন প্রাতে শরৎচন্দ্র একখানি নৌকা লইয়া মনোহরগঞ্জে গেলেন—সেখানকার নাবালক জমীদারগণের ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—তিনি শরৎচন্দ্রের আত্মীয়, তিনি অতি সরল ও ধর্ম্মভীরু লোক—লোকের কোন রূপ উপকারে আসিবার সুযোগ পাইলে, আর তাহার সেবা করিতে কাতর হন না, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অপকীর্ত্তি দমন করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। শরৎচন্দ্র সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া,যখন ডাক্তার সাহেবকে লইয়া যাইবার মানস প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি ডাক্তার সাহেবকে একখানা চিঠি দিব? শরৎচন্দ্র বলিলেন, "সেই জন্যই ত আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।" শরৎ

অবিলম্বে তাঁহার পত্র লইয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত দেখা করিলেন—ডাক্তার সাহেব পত্র পাইবা মাত্র শরতের সঙ্গে রামপুর যাত্রা করিলেন। অল্প পথ, অল্প সময়ে, ডাক্তার সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। রোগীকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, "দুই তিন দিন গেলে, তার পর যাহা হয় বলিবেন।" দুই তিন দিনের পরিবর্ত্তে প্রায় সপ্তাহ কাল কাটিল তবুও রোগের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এমন সময় একদিন সহসা রোগ বৃদ্ধি হইল। শরৎচন্দ্র অতি ব্যাকুল ভাবে নৌকা লইয়া ডাক্তার সাহেবের নিকট দৌড়িলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন আর ভয় নাই—রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই অবস্থা হইতে ক্রমে পীড়ার প্রকোপ কমিতে থাকিবে, আমি এই যে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়া গেলাম, এই ঔষধ আমার ওখান হইতে আনাইয়া লও। রোগীকে বিশেষ সাবধানে রাখিবে—যেন কোন ত্রুটি না হয়। তা হলেই রোগী এবার বাঁচিয়া যাইবে। প্রায় মাসাধিক কাল রোগ ভোগ করিয়া ও আরও মাসাধিক কাল বিশেষ সাবধানে থাকিয়া বিনয়ভূষণ আরোগ্য হইলেন। তাঁহার পীড়িতাবস্থায় শরতের সদ্ব্যবহার, ক্লেশ ভোগ ও ত্যাগ-স্বীকারের কথা শুনিয়া, তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন ও জননী ও ভগ্নীর নিকট বলিলেন, যে ভগবান তাঁহাকে এ যাত্রা বাঁচাইবার জন্যই শরৎকে উপলক্ষ্যরূপে পাঠাইয়া ছিলেন। তাহা না হইলে, শরৎ গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী না গিয়া, এত ক্লেশ-স্বীকার করিয়া আমার এখানে আসিবে কেন? তাঁহার চিকিৎসাতে কত টাকা খরচ হইল, জানিবার জন্য অনেক অনুনয় করিয়া শরৎকে জিজ্ঞসা করিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছুতেই

তাহা বলিলেন না। শরৎচন্দ্র বলিলেন—দেখ বিনয়, তুমিই ত বলিতেছিলে,—ভগবান আমাকে তোমার সেবার জন্য উপলক্ষ্যরূপে পাঠাইয়াছিলেন—যদি এমন বিশ্বাস থাকে, তবে বিনানুসন্ধানে তাঁহার প্রদত্ত দান গ্রহণ কর, গোল ক'রো না।

শরৎচন্দ্রের গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইয়া আসিল, তিনি শীঘ্র কৃষ্ণনগরে যাইবেন—বিনয়ভূষণ যে তিন মাসের বিদায় পাইয়াছিলেন তাহাও অতীত প্রায়। স্থির করিলেন যে দুই বন্ধুতে একত্রে কলিকাতায় যাইবেন—পরে শরৎ তথা হইতে কৃষ্ণনগর আসিবেন। এমন সময় কুসুমপুর হইতে কালাচাঁদের বিবাহের এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। পত্রপাঠে বিনয়ভূষণ ভাবিলেন, সেই হতভাগা বাঁদরের বিবাহে যাবেন কি না, কিন্তু প্রেমমালার সন্দর্শন-লালসা তাঁহার সকল আপত্তি গ্রাস করিল। কলিকাতা যাইবার সময়ে, শ্বশুরালয় হইয়া যাইবেন, এবং শরৎকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের বিবাহ।

আজ কালাচাঁদের বিবাহ। দ্বিতীয় বিবাহ বলিয়া তাঁহার বিবাহে "আইবড় ভাত" প্রভৃতি বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহারএকটা কোন বিশেষ আয়োজন নাই। এবার বিবাহে কালাচাঁদ বিবাহের একটা নূতন ভাব—একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ—একটা স্বতন্ত্র তৃপ্তি, অনুভব করিতে

পাইতেছেন না। যে সময় কালাচাঁদ বিপত্নীক হন, সে সময়ে অনেক লোকের বিবাহই হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিবাহের আমোদ অনুভব করিবার সময় আসিবার পূর্ব্বেই, কালাচাঁদের সে সকল আমোদ হইয়া গিয়াছে।

প্রাতে বিনয়ভূষণ ও শরৎচন্দ্র সদর বাটীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় কালাচাঁদ বিনয়ভূষণকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ ঘোষজা, এবার বিয়েটা, বিয়ে ব'লে মনে হচ্ছে না। বিনয়ভূষণ কৌতুক করিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন—কুটুম্ব, তুমি বুঝি কিছু জান না?

কালা। কি জানিব ভাই?

বিনয়। আহা, এতক্ষণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যে তোমাকে সমস্ত সংবাদ দিতে পারিতাম।

কালা। ওহে ঘোষজা, কি বল না ভাই?

বিনয়। তোমার যে নিকে হচ্ছে হে, বিয়ে হ'লে তোমার কাপড় চোপড়—তোমার মন—প্রাণ—সকলই রংচঙে দেখাত, আর তোমারও বিয়ে, বিয়ে বলে বোধ হ'ত, কিন্তু তোমার ত বিয়ে নয়, নিকে হচ্ছে।

কালাচাঁদ বিনয়ভূষণের সহিত আমোদ করিতে গিয়া, প্রাণে আঘাত পাইয়াছেন—চটিয়া লাল হইয়াছেন—ক্রোধকম্পিত কলেবরে বলিলেন কি, আমি মুসলমান—আমার নিকে—এত বড় আস্পর্দ্ধা! বিনয়ভূষণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কুটুম্ব চটিও না—শেষে বিয়ের দিনে চটিলে জোড়া দিতে, কাদা কোথায় পাব ভাই—এ রো'দে চট্‌লে এমন ফাটা ফাট্‌বে যে কিছুতেই জোড়া দেওয়া যাবে না—আর তাহ'লে

তোমার বিয়েও ফস্‌কে যাবে, বিয়ে ফস্‌কাবার কথা শুনে কালাচাঁদ মেজাজ্‌টাকে একটু ঠাণ্ডা করিয়া বলিলেন—না, তোমার ভারি অন্যায়। বিনয়ভূষণ বলিলেন—নিকে শুনে কি এত চট্‌তে হয়—নিকেতে দোষ কি? যদি সে দিকে একটা ছেলে কি মেয়ে থাকে, তবে এসেই আমাকে পিসেমশাই বলিয়া ডাক্‌বে—সে ত বেশ সুবিধার কথা—চট কেন? কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমি ওটা অন্য রকম বুঝেছিলাম। বিনয়ভূষণ বলিলেন—এখন ত খাঁটি কথা বুঝিয়াছ? কথাটা কি জান—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোককে বিধবা বলে—তা তোমার এক-বার বিবাহ হয়ে, স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, সুতরাং তুমিও বিধবার সামিল—আর তোমার মত বিধবার বিবাহকে নিকে ব'ল্লে কিছু দোষ আছে কি? তাই নিকে বলিতেছিলাম। কালাচাঁদ আবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন। পুরুষ মানুষের স্ত্রী মরিলে, তাকে বুঝি বিধবা বলে—বেশ, তোমার বুঝি কিছু জ্ঞান নাই—বিধবার বুঝি দাড়ি গোঁফ হয়? বিনয়ভূষণ বলিলেন—বেশ, তা জাননা বুঝি, অল্প দিন হইল, খবরের কাগজে দেখেছি, আমেরিকাতে একজন স্ত্রীলোকের দাড়িগোঁফ উঠেছে, আর আমাদের দেশে তোমার উঠেছে—তাই তোমাকে বিধবা বলিতেছি।

কালাচাদ। আমি পুরুষ মানুষ, আমি বিধবা কেন হব?

বিনয়। না, তুমি স্ত্রীলোক, কেমন শরৎ, ভায়াকে স্ত্রীলোকের মত বলিয়া বোধ হয় না?

শরৎ। তোমার কুটুম্ব তুমি ভাল জান, তবে দেখ্‌তে কতকটা সেই রকম দেখায় বটে।

কালা। চটিয়া বলিলেন—না, আমি পুরুষ মানুষ।

বিনয়। তোমার কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে, যে তুমি স্ত্রীলোক।

কালা। না আমি পুরুষ।

বিনয়। না, তুমি স্ত্রীলোক।

এইরূপে বাদানুবাদ করিতে করিতে, কালাচাঁদ কাঁদিয়া ফেলিলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে একগাছা লাঠি হাতে লইয়া "তবে—রে— আমি স্ত্রীলোক!" এই বলিয়াই এক লগুড়াঘাত। লগুড়াঘাত করিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাহাকে মারিলেন, তাহার গায়ে লাগিল না। লাঠি মৃত্তিকা স্পর্শ করিল, বিনয়ভূষণ ও শরৎচন্দ্র হাসিতে হাসিতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহাকে মারিলেন, তাহার গায়ে লাগিল না দেখিয়া, লাঠি তুলিয়া লইয়া আবার মারিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে একজন ধরিল—অমনি ক্রোধেঅন্ধ হইয়া লাঠি ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিলেন—ছাড় শালা, এখনই মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌ব। বিনয়ভূষণের শ্বশুর লাঠি গাছি ধরিয়া বলিলেন, "হতভাগা ছাড়, ছেড়েদে।" কালাচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাকে স্ত্রীলোক বলে—আমাকে বিধবা বলে—আমার বিধবা বিয়ে হচ্ছে বলে।" ছোট কর্ত্তা হাসি সাম্‌লাইতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—কালাচাঁদ কাকার হাসি দেখিয়া আরও চটিয়া উঠিলেন। "আমি বাবাকে বলিব" বলিয়া যেমন গমন করিবেন, চক্ষের জলে পথ পিছল্ হয়েছে, অমনি এক আছাড়। বাপ আসিয়া ধরিয়া তুলিলেন, সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনিও হাসিতে লাগিলেন—কালাচাঁদ আরও চটিল। যে শোনে সেই হাসে, কালাচাঁদের

মহা বিপদ হইল। ক্রমে সংবাদটা বাড়ীর ভিতর গেল। শেষে জননী অনেক মিষ্ট বচনে, কালাচাঁদকে শান্ত করিলেন।

ক্রমে বরযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। যাঁহারা বরযাত্রে যাইবেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন। একমাত্র সন্তান সুতরাং বিবাহের পূর্ব্ব-লক্ষণ কিছু কিছু দেখা দিতে লাগিল। বর বলিলেন যে, এবার "বিয়ে বিয়ে" ব'লে মনে হচ্ছে বটে। অনতিকাল মধ্যে বরকে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত করা হইল। বর মহাশয় পাল্‌কীতে উঠিলেন। যে গ্রামে বিবাহ হবে, সে গ্রাম অনেক দূরে না হইলেও, নিতান্ত নিকটেও নহে। বরকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও বরকে লইয়া যাত্রা করিলেন। বাদ্যের কোলাহল বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ। একমাত্র সন্তান—সাদের বিবাহ, সুতরাং সে অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি হয় নাই। প্রতিবেশীগণের বালক বালিকাদের প্রাণমন নাচাইয়া, পথঘাট বন উপবন প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজনা, বর ও বরযাত্রীদের অগ্রে অগ্রে চলিল, পথের দুই ধারে কত বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক, বর দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে—কালাচাঁদের মন বাজনার তালে তালে তখন নাচিতেছে, রাস্তার দুই ধারে লোক দেখিয়া কালাচাঁদ হাসিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—আজ কি সুখের দিন—কত লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে—আমি আজ যেন মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সাজিয়াছি—না তা কেন, মহারাণী যে স্ত্রীলোক—আঃ—কি বিপদ, আবার সেই স্ত্রীলোক, আমি ত আর মেয়ে মানুষ নই—আমি যে পুরুষ মানুষ—

আবার সেই সকালের কথা—ছাই পাঁস—মাথা মুণ্ডু, আমি কিছুই সাজি নাই, বা, তাইবা কেন হবে, আমি স্বয়ং শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দে, পাল্‌কী চড়িয়া যাইতেছি, কিছুই সাজি নাই, এমন কি কখন হয় ? তবে আমি কি সাজিয়াছি ? ক্রমে চিন্তাটা আরও চাপিয়া ধরিল, কালাচাঁদ এ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন —প্রাণটা যেন আই ঢাই করিতেছে—চিন্তাটা ক্রমে মর্ম্ম-যন্ত্রণার আকার ধারণ করিল—তখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন—আর কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, স্থির করিলেন যে তিনি সং সাজিয়াছেন, যেমন এই ভাবা, আর অমনি পাল্‌কী হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া— তবে—ব্যা—সব সং দেখিতে আসিয়াছিস্ ? এই জ্যাতি দিয়ে কান কেটে নেব। ছেলে মেয়ে, বৌ ঝি গুলা—"ওমা এযে পাগল রে—" বলিতে বলিতে দৌড়ে পালাইল। বরকর্ত্তা দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন কুলগৌরব পুত্র ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, কতকগুলা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ওরকম করিলে বিয়ে হবে না, মেয়ের বাবা যদি জানিতে পারে যে, তোমার এরকম ক্ষেপা রোগ আছে, তা হলে তোমায় মেয়ে দেবে না। এই শুনিয়া কালাচাঁদের চক্ষু দুটী আকাশে উঠিল। কালাচাঁদ একখানি আধপোড়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, অনেক পরে চক্ষুগহ্বর হইতে অশ্রু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার পট্টবস্ত্র সিক্ত করিল—করযোড়ে পিতাকে বলিলেন, "বাবা—আর কর্‌ব না—খুব ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌ব।" পিতা বলিলেন—ঠাণ্ডা হয়ে না বস্‌লে আমি এখনই

এই সকল লইয়া বাড়ী ফিব্‌ব—আর যাব না। পুত্র বড় বেগতিক দেখিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, একবারে পিতার চরণে ধরিল—পিতা বলিলেন, ভাল চাও ত আস্তে আস্তে, পাল্‌কীতে উঠিয়া বসগে। বুদ্ধিমান ছেলে পাল্‌কীতে উঠিয়া বসিল। সন্ধ্যা অতীত প্রায় এমন সময়ে পরিশ্রান্ত হইয়া বরযাত্রগণ বব লইয়া কন্যার দ্বারে উপস্থিত। কন্যাকর্ত্তা সবান্ধবে অগ্রসর হইয়া বরকর্ত্তা, ভাবী জামাতা ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণকে সাদবে গ্রহণ কবিলেন, সুসজ্জিত সদর বাটীতে বরসভা প্রস্তুত। মুহূর্ত্তমধ্যে বাদ্যের হুঙ্কারে ও লোকজনের কলরবে গৃহপূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে বরসভা লোকে লোকারণ্য হইল। নরসুন্দর মহাশয় বরকে লইয়া বরাসনে বসাইয়া দিলেন। শুভ্র আলোকমালা, অমানিশার অন্ধকারে ক্ষুদ্র দীপালোকেব ন্যায়, ববের গাত্রস্পর্শে ম্লান হইয়া গেল। অনন্ত গগনব্যাপী সুগভীর শ্যামল জলধর ক্রোড়ে সৌদামিনী যেমন হাসিতে না হাসিতে ম্লানমুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়—ক্ষণস্থায়ী বসন্তেব সুবিমল মৃদু হিল্লোল, প্রবাহিত হইয়া কুসুমনিচয়ের প্রাকৃতিক হাসি ফুটাইতে না ফুটাইতে, যেমন গ্রীষ্মের ভীষণ আতপ-ক্রোড়ে শয়ন করে—আর সে মধুময়ী বসন্তবালাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সন্ধ্যা-সমাগমে দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদয় হইতে না হইতে, ধরা যেমন অন্ধ-কারের ক্রোড়ে ডুবিয়া যায়--সেইরূপ কালাচাঁদের শুভ পদা-র্পণে, তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া, লোকের মন ভাঙ্গিয়া গেল। যাহারা "কেমন বর" দেখিবে বলিয়া তাকাইতে ছিল, তাহারা ভ্রূকুঞ্চিত ও নাসাবক্র করিয়া মুখ ফিরাইল—বরের ভাবী শ্বশুর

বিষণ্ণ মনে ও অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্তঃপুরাঙ্গণারা "কেমন বর, কেমন বর" বলিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন—যেন তাঁহারা মালা চন্দন লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কুসংবাদ বায়ুগতিতে ধাবিত হইয়া শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—আনন্দ কোলাহল উঠিতে না উঠিতে নির্ব্বাপিত হইল—নিরাশার আঁধারে লোকের মন ডুবিল—দুঃখ ও বিষণ্ণতা ভারে সকলের মুখ নত হইল।

পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কেন দেখে শুনে কি বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হয় নাই? ঘটক বেশধারী এক প্রকার স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনা হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই—কোন কোন স্থানে সামাজিক প্রথার অনুরোধে মূর্খ লোকেরা বিবাহের এই দালালগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। এই ধর্ম্মজ্ঞানহীন অর্থলোলুপ ঘটকগণের কুমন্ত্রণা-জালে পড়িয়া কত পিতা মাতার বালক বালিকা যে উত্তরকালে অশান্তির আগুণে পুড়িয়া মরে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই বিবাহ প্রস্তাব ও ইহার শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের ভার রামধন চক্রবর্ত্তী নামে একজন ঘটকের উপর ছিল, সেই প্রতারক কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ করিয়া বরকর্ত্তার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিয়াছে—এতে আর দোষ কি—তোমরা পরস্পরকে না জানিয়া—পাত্র পাত্রী নিজ চক্ষে না দেখিয়া, যেমন এরূপ গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হও—তাহার ফলভোগ কর। এখন চিরদিনের জন্য নিজ নিজ ভাগ্যকে

নিন্দা কর ও জীবনাবধি অশান্তি ভোগ কর এবং দুই জনে দ্বন্দ্ব কর, ঘটক মহাশয় কিছু পাইলেই, হইল। অনেক ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশের পর কন্যাকর্ত্তা "বিধাতার ভবিতব্যতা" এই চলিত কথার উপর নির্ভর করিয়া শান্ত হইলেন এবং অন্যান্য সকলকে শান্ত করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের আগুন নিবিবার নহে—মনাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

গৃহ কর্ত্তা ও পরিজনবর্গ আপনাদের ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন—ভট্টাচার্য্যে ভট্টাচার্য্যে, বালকে বালকে বিদ্যা, বাকৃপটুতা ও তর্কশক্তির পরীক্ষা হইতে লাগিল। এক এক বার এক পক্ষের জয়ে মহা কোলাহল ধ্বনি উঠিতেছে। বিবাহান্তে কুলকন্যা ও বধূগণ বর কন্যাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন। অন্যান্য লোক আহারাদি সমাপনান্তে স্ব স্ব গৃহে গেলেন। বরযাত্রীগণের শয়নের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সকলেই তথায় শয়ন করিয়াছেন—কেবল বিনয়ভূষণ ও শরৎচন্দ্র শয়ন করেন নাই। দুই জনে বসিয়া কালাচাঁদের পিতার নীচ স্বার্থান্ধ প্রবঞ্চনার সমালোচনা করিতেছেন। বিনয়ভূষণ বলিলেন—দেখ শরৎ, এইরূপ নীচ ও ঘৃণিত কার্য্যে যাহারা সংসৃষ্ট হইতে লজ্জিত না হয়, তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিতে, আমার বড়ই ঘৃণা হয়। আমার শ্বশুর ত বেশ ভাল মানুষ লোক, তিনি বর্ত্তমান থাকিতে, তাঁহার কনিষ্ঠ এমন অসৎ কাজ করিতে সাহস করে, এই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার—বড় ক্ষোভের কথা। শরৎ বলিলেন—বোধ হয় তিনি ইহার বিন্দু

বিসর্গ কিছুই জানেন না, জানিলে অবশ্যই সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িত। আর একটি ব্যাপার দেখ্‌লে? তাই না হয় যেমন ছেলে, তেমনি একটা পাঁচ পাঁচি গোছ মেয়ে যোগাড় ক'রে বিয়ে দে, তা না, একটি পরীর মত সুন্দরী মেয়েকে একটা বাঁদরের হাতে দিতে হ'ল, একি বাপ মার কম কষ্ট! আচ্ছা ওরাত বিবাহ না দিলেই পারত, তবে কেন দিলে। বিনয়ভূষণ বলিলেন—বেশ তা বুঝি জান না, ঐ রাত্রিতে ঐ কন্যার বিবাহ না দিলে, কন্যা কর্ত্তার জাতি যায় —আর উপস্থিত পাত্রই বা কোথায় পাইবে, কাজে কাজে অনন্যোপায় হইয়া বেচারী কন্যাদান করিল—কোন উপায় থাকিলে কি আর লোক এমন গোবরের পুতুলকে মেয়ে দেয়।

এমন সময়ে শুনিলেন সেই নিস্তব্ধ রজনীর ঘন অন্ধকার ও নৈশ সমীরণ বামাকণ্ঠের গীতধ্বনি বহন করিতেছে। উভয়ে শুনিলেন—

সখী, প্রাণ খুলে কথা কই কার সনে,
মনের ব্যাথা মনে রয়, কেহ না শুনে।

শরৎ বলিলেন—এ কোমল কণ্ঠ-নিনাদ কোথা হইতে আসিতেছে—এ বিবহ-সঙ্গীত কে গাহিতেছে। বিনয় বলিলেন—তা জান না—পাড়ার যত বৌ ঝি একত্র হইয়া ঐ বাঁদরটাকে নিয়ে আপনাদের মনের সাদ মিটাইয়া স্বাধীনতা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছে। শরৎ বলিলেন—তা ত হবেই মানব প্রকৃতি কোথা যাইবে? তোমার আমার বেলা সর্ব্বত্র যাইবার অধিকার—আর রমণীর বেলা—অবলা—দুর্ব্বলা, আত্মরক্ষায় অসমর্থা—আর নিজেদের বেলায় পাপের অধম-

তম স্থানে দিবানিশি যাপন করিয়াও কোথায়ও যাইতে নিষেধ নাই—এই “বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গিরে” যাহারা দেয় তাহাদের কার্য্যের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। বিনয় বলিলেন—বাসরঘর বঙ্গললনার প্রমোদ কানন—যাঁহারা শ্বশুর ভাশুরের ভয়ে, সূর্য্যালোককেও ভাল করিয়া নয়ন মেলিয়া দেখেন না, তাঁহারা অনেক যত্নের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মনের সুখে অপরিচিত জামাই বাবুর সহিত কৌতুকালাপে মগ্ন আছেন। সকল প্রকার সামাজিক সাম্মলনের মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান আমোদ প্রমোদের স্থল। এখানে বালক বৃদ্ধ, পুরুষ রমণী, যুবক যুবতী, সকলে মিলিত হন। এমন একটি উৎসব-স্থান যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র থাকে বিধিমতে তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

কালাচাঁদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয় স্বজন সকল ক্রমে ক্রমে বিদায় হইতেছে—বিনয়ভূষণও কলিকাতা যাইবার আয়োজন করিতেছেন। কয়েক দিনের জন্য প্রেমমালার নিকটে ছিলেন—প্রেমের বস্তু—ভালবাসার লোক, নিকটে থাকিলে স্বভাবতই লোক আপনার দুঃখ যন্ত্রণার কাল দাগ ভুলিয়া যায়—অশান্তির চিত্র ক্ষণকালের জন্য অতীতের স্মৃতিতে

পরিণত হয়—মন সুখের সরোবরে—শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে—তাই আজ কয়েকদিনের জন্য বিনয়ভূষণ মনের ক্লেশ ও দুর্ভাবনার ভারমুক্ত হইয়া সংসার-জীবনে স্বর্গের সুখভোগ করিতেছেন। সময়ে সময়ে মানবজীবনে এমন শুভলগ্ন উপস্থিত হয়, যখন নানা পাপ প্রলোভনপূর্ণ অশান্তির অগ্নিতে চিরপ্রজ্জ্বলিত মরুময় সংসার-প্রান্তরে মানুষ নন্দনকাননের পারিজাত-পরিমল সেবন করিয়া—সংসার বুদ্ধির অতীত প্রেম-সম্মিলন সম্ভোগ করিয়া—প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া—আপনাতে অন্যকে লইয়া—অন্যেতে আপনাকে ডুবাইয়া চিরকৃতার্থ হয়—এ দুঃখময় সংসারে সেই স্মৃতিই মানুষকে আশা দিয়া বাঁচাইয়া রাখে—দেব প্রকৃতি সাধু ও সাধ্বীর জীবনে সে সুখ চিরাধিরাজিত থাকে—কুশিক্ষার দাস—মানুষ কুবুদ্ধি-পরিচালিত মন লইয়া কিরূপে সে সুখ-তারাকে জীবনের চির অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিবে? বিনয়ভূষণের পক্ষে সে সুখ মুহূর্ত্তকালের জন্য মাত্র, প্রভাত সমীরণ সূর্য্যকিরণ গ্রহণ করিতে না করিতে, যেমন যামিনীর নেত্রাসার মুক্তাফল সদৃশ শিশিরবিন্দুনিচয় অচিরে শুখাইয়া যায় —সংসার-সুখ লোলুপ মানব-প্রাণে সাধু ইচ্ছা উদয় হইতে না হইতে, ক্ষণপ্রভার ক্রীড়ার ন্যায় দেখা দিতে না দিতে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ সে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ—বিমল আনন্দ বিনয়ের প্রাণপটে প্রতিভাত হইতে না হইতে, আবার সংসারের আঁধার আসিয়া তাহা আপন ক্রোড়ে আবৃত করিল। বিনয়ভূষণ কলিকাতায় যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। আগামী কল্য তিনি সবান্ধবে যাত্রা করিবেন।

প্রেমমালার জীবনে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সর্ব্বদা স্বামীর নিকটে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি বিনয়ভূষণের কলিকাতা গমনে যে ক্লেশ ও মর্ম্ম বেদনা পাইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? তিনি কাতর হইয়াছেন —তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছে—কতবার তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে, তিনি অতি সাবধানে তাহা গোপন করিয়াছেন। শ্যামল ঘনোদয়ে ময়ূরের নৃত্য যেমন স্বাভাবিক—গগন-ক্ষরিত বারিবিন্দু পানে শুষ্ককণ্ঠ চাতকের আনন্দ যেমন স্বাভাবিক—পৌর্ণমাসী রজনীর দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্না-সমুদ্রে—মৃদুবায়ু হিল্লোলে চকোরের নৃত্য যেমন স্বাভাবিক—সংসার ও ধর্ম্মজীবনের সহায়—স্বামীধনকে সতত চক্ষে চক্ষে রাখা অনুক্ষণ তাঁহার দর্শন-জনিত সুখে প্রাণমনকে পরিতুষ্ট করা, সাধ্বী রমণীর পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। ভালবাসার লোককে কত বার দেখিলে তৃপ্তি জন্মে, কে বলিতে পারে? যে ভাল বাসার চক্ষে কখন দেখিয়াছে, সে জানে, যে সে তৃষ্ণা—সে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইবার নহে, কখনও শেষ তৃপ্তি লাভ হয় না। এই জন্যই বিজ্ঞজনে বলিয়া থাকেন, দম্পতীর সম্বন্ধ অনন্ত কালের জন্য—কখন শেষ হইবার নহে। যত সহবাস—যত মিলন—একত্র বাস ও পরস্পরে আত্ম সমর্পণ করিয়া মিলিত হইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া পড়ে। তৃপ্তি লাভ হয়, কারণ তৃপ্তিলাভ না হইলে, এত প্রবল ইচ্ছা কেন? কিন্তু তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয় না, কারণ তাহা হইলেই বা প্রবল ইচ্ছা কেন থাকিবে। প্রেমমালার প্রাণে এ স্বাভাবিক ইচ্ছার স্রোতঃ প্রবল থাকিলেও বিনয়ের মনোবেদনা ও অশান্তিকে পাছে বৃদ্ধি করা হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা আত্মগোপণ করিয়া চলিতে

লাগিলেন। প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়-সূর্য্য কোন দেশে উদয় হইবে—সন্ধ্যা সমাগমে প্রকৃতির শুভ্রকান্তি ও হেমালঙ্কার পরিহারক বিবসনা তমসার ভীষণ আক্রমণের ন্যায়, সবলা অবলার কোমল হৃদয় সেই কল্পনার অন্ধকারে আবৃত হইল—তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল—হৃদয় হুহু করিতে লাগিল—কোন কথা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না—তিনি স্বজনে নির্জ্জনতা—গৃহে অরণ্য—মিষ্ট কথায় অশান্তি—আদরে অত্যাচার অনুভব করিতে লাগিলেন। কেন এমন হইল? কে বলিবে কেন এমন হইল। প্রেমলালা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে নহেন, তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহা অল্প হইতে পারে, কিন্তু তাহা সৎশিক্ষা—তাঁহার মন কোমল বটে, কিন্তু সে মনে দৃঢ়তার অভাব নাই। তিনি ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য্যাবলম্বনে প্রতিবেশীগণের আদর্শ স্থল বলিয়া পরিচিত। এই অল্প বয়সেই তিনি গৃহকর্ম্ম, লোকের পরিচর্য্যা, পরিচ্ছন্নতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের নিত্য আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন। গো সেবা হইতে রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য অতি আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করেন—ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে, সত্য কথা বলা, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া বুঝিয়াছেন—নিজজ্ঞানে ও গুরুজনের উপদেশে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পান। এই সকল কারণে তিনি অনেকের অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। সকলের আদর্শ এই যুবতী, আজ স্বামীর অদর্শনচিন্তায় এত কাতর হইলেন কেন? আমরা আবার বলি কেন হইলেন,

"কে জানে"। প্রতিধ্বনি বলিতেছে "কে জানে"। প্রতি-ধ্বনি ভবিষ্যতের ঐ আঁধারে লুকাইল।

সকলে আহারাদির পর অন্যান্য দিনের ন্যায় শয়ন করিয়াছেন, বিনয়ভূষণ শরৎকে বৈঠকখানায় রাখিয়া নিজের শয়ন গৃহে গমন করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন প্রেমমালা নত নেত্রে বসিয়া আছেন, বিনয় বলিলেন—প্রেম! কি ভাবিতেছ? প্রেমমালা একটু অপ্রস্তুত হইয়া আত্মভাব সংযত করিয়া বলিলেন, "কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নহে।" বিনয় বলিলেন, "বল দেখি শরৎ কেমন লোক?" প্রেমমালার মন হইতে মুহূর্ত্ত কালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। অত্যল্প কাল মধ্যে মনকে আবার নূতনভাবে সাজাইয়া বলিলেন, "তোমার ভালবাসার লোক কি কখন মন্দ হইতে পারে?" বিনয় বলিলেন—কেন আমার ভালবাসার লোক কি মন্দ হইতে পারে না? তুমি স্পর্শমণি, তোমার সংস্পর্শে আমি লৌহ, স্বর্ণ হইয়াছি সত্য, কিন্তু স্পর্শমণির গুণ ত আর আমাতে বর্ত্তায় নাই যে, আমার সংস্পর্শে যে আসিবে সেই সৎলোক হইবে! প্রেমমালা একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদু হাসিতে অধর ওষ্ঠকে অলঙ্কৃত করিয়া বলিলেন—তোমার মুখের কাছে পারা ভার। আজ কয়দিন হাসিতে হাসিতে আমার পেটে বেদনা ধরেছে—আর হাসিতে পারি না। আমি কি বলিলাম আর তুমি বা তার কি অর্থ করিলে! তোমার বন্ধুটি অতি সুন্দর লোক—কথা গুলি অতি মিষ্ট—স্বভাবটি কেমন নম্র। বিনয় বলিলেন—তোমাকে শরৎ যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার কোন্ গুলির প্রশংসা কর? প্রেমমালা বলি-

লেন—আমি তাঁহার কোন কথাই মন্দ মনে করি নাই—সকল কথাই ভাল লাগিল। আলাপের রীতি, তাহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করিতে, শিষ্টাচার ও শীলতা রক্ষা করিতে শরৎবাবু বেশ পটু।

বিনয়ভূষণ বলিলেন—শরতের বুদ্ধি ও তর্ক শক্তি অত্যন্ত প্রবল। স্থান ও অবস্থার অনুরূপ আচরণে বিশেষ নিপুণ। এমন উপস্থিত বক্তা ও পরিহাস পটু, যে কথায় কথায় লোককে হাসাইতে—লোকের সঞ্চিত শোক ও দুঃখ দূর করিতে সম্যক পারদর্শী। প্রেমমালা বলিলেন—না হবে কেন, তোমার বন্ধু ত? এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সুখের সন্ধ্যারাত্রি ক্রমে গভীর রজনীতে পরিণত হইল। বিনয়ভূষণ ও প্রেমমালা মনের সুখে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুষুপ্তি-জনিত সুখভোগও প্রেমমালার ভাগ্যে বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না—যামিনী শেষে নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেমমালা ঘুমে ঘোর—তাঁহার মন কি ভাবিল, হৃদয় কি গুরু আঘাত পাইল, সে নিদ্রিত চক্ষু কি ভীষণ দৃশ্য দেখিল? প্রেমমালা সিহরিয়া উঠিলেন, সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল—ঘুম ভাঙ্গিল, অনুভবে বুঝিলেন, বিনয় তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়া ঘুমাইতেছেন। প্রেমমালা বাঁমহাত খানি আস্তে আস্তে, বিনয়ের মস্তকের উপর রাখিলেন—প্রাণের তৃপ্তি হইল না—আবার হাত দিলেন—পিপাসা মিটিল না—আবার কি ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবার আর শয্যাতে থাকিতে পারিলেন না—

ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিলেন— প্রদীপ জ্বালিলেন—অতৃপ্ত নয়নে নিদ্রিত স্বামীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে সেই নয়ন মন মুগ্ধকর দৃশ্য—নিদ্রিত স্বামী, আর স্বপ্নবিতাড়িত চিত্তের চঞ্চলতা ও নিরাশা, সেই দৃশ্য—সেই স্বামীকে, হৃদয়ের নিকট, কল্পনার বস্তু—অতীতের স্মৃতি রূপে উপস্থিত করিতেছে —প্রেমমালা অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা কামিনী একাকিনী বসিয়া নীরবে নেত্রনীরে বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিলেন। সহসা বিনয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন প্রেমমালা বসিয়া কাঁদিতেছেন—চক্ষের জলে পরিধেয় সিক্ত করিয়াছেন। তখন বিনয়ভূষণ নিদ্রার ঘোরে উঠিয়া বসিলেন এবং সেই অশ্রুপ্লাবিত ও প্রেমভরা মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাইয়া বলিলেন—প্রিয়তমে! তোমার কি এই বিবেচনা, এত কাতর হ'লে—এত চক্ষের জলে ভাসিলে, আমার মনপ্রাণ সকলই যে চঞ্চল করিয়া তুলিবে, তুমি এমন হ'লে কেন? এইরূপ বুঝাইতেছেন এমন সময়ে উষা সমীরণ প্রবাহিত হইয়া গৃহের একটি গবাক্ষের কপাট খুলিয়া দিল, বিনয় দেখিলেন, পূর্ব্ব গগণ আরক্তিম হইয়া আসিতেছে, অনতি কাল মধ্যে জীবজগৎ জাগিয়া উঠিবে—ধরণী কোলাহল-ময় হইবে—বিনয়ভূষণও এই অবসরে প্রেমমালাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া, শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে—দ্রব্যাদি সমস্ত নৌকাতে গিয়াছে —বিনয়ভূষণ সবান্ধবে তাঁহার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে যাইবার সময়ে কি একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভুলিয়া ছিলেন বলিয়া, যেমন গৃহ

প্রবেশ করিবেন, অমনি দেখিলেন সেই ম্লানমুখী বিষাদ মেঘে মুখ ঢাকিয়া, দ্বারের পার্শ্বে দাড়াইয়া আছেন—কেন এমন দীন-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন? একটিবার চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া—প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া,—বিদায় লইবেন বলিয়া, সেখানে দাড়াইয়া আছেন। বিনয় শরৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখ ভাই, ইনি কাল সমস্ত রাত্রি চক্ষের জলে ভাসিয়াছেন —ইহাকে একটু হাসাইতে পার? ভাই, আর একটানা বর্ষা ভাল লাগে না—জলে জলে সব ভিজিল—কাদায় কাদা —তুমি ভাই, একটু রোদ দেখাও ত, তখনও প্রেমমালার চক্ষে জল ধারা—একটু মৃদুস্বরে ভগ্নহাসি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার মত সকলেত আর পরিহাসপ্রিয় নহেন, যে সময়াসময় বিবেচনা শূন্য হইয়া পরিহাস পটুতা দেখাইবেন।" বিনয় পুনরায় শরৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ওহে দেখ দেখ, বৃষ্টি কালিন জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতেছে, এখনই রামধনু দেখা যাবে। সকাল বেলা কেহ কখন রামধনু দেখিতে পায় না—শরৎ, এই বেলা দেখে নাও, অনেকের নিকট গল্প করিতে পারিবে। প্রেমমালা আর হাসি রাখিতে পারিলেন না

একদিকে চক্ষে জল—আর একদিকে অধর ওষ্ঠে হাসির উদয—অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্রমে চক্ষের জল শুকাইল হাসির স্রোতঃ বাড়িল—লজ্জা আসিয়া অদৃশ্য আবরণে তাহার নয়ন-দ্বয়কে আবৃত করিল—তিনি নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনয় ও শরৎ দুই জনেই বলিলেন, "তবে আমরা এখন চলি-লাম।" বিলম্ব হয় দেখিয়া, প্রেমমালা সরলমনে হৃদয়ধনকে বিদায় দিয়া, আঁধার প্রাণ ও বিষণ্ণ মন লইয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নিরাশা।

শরৎচন্দ্র ও বিনয়ভূষণ কৃষ্ণনগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নদীতটে এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। দেখিলেই বোধহয় গভীর ক্ষোভ ও মনোবেদনার তীক্ষ্ণ বাণ তাঁহাদের প্রাণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে। মুখে কথা নাই—চক্ষে জল নাই—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না, বুঝা যায় না—দুইজনে এমন ভাবে দৃষ্টিতে দৃষ্টি ঢালিয়া বসিয়া আছেন, যে দেখিলে বোধ হয় যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী দুইটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে—বিনয়ভূষণ ও শরৎচন্দ্র একই চিন্তাসূত্র ধরিয়া একই ভাবে মগ্ন হইয়াছেন—উভয়ে উভয়ের প্রাণের আবেগ, পূর্ণ ভাবে অনুভব করিতেছেন—তাঁহারা চক্ষে চক্ষু, ভাবে ভাব, আত্মায় আত্মা মিলাইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, "গোপাল বাবু ডাকিতে-ছেন।" এই কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে, দুই জনেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং এক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন।

গোপাল বাবু শরৎকে বলিলেন, "দেখ আমার বড় অসুখ বোধ হইতেছে, আর পারি না, যাহারা খাটিতেছে তাহারা ছেলে মানুষ, তোমরা দুই জনে এখানে একটু থাক। আর বেশী বিলম্ব নাই, এক ঘণ্টা হইলে সমস্ত কাজ শেষ হইয়া

যাইবে।" তখন শরৎ বলিলেন, "আপনি বাসায় যান—আমরা অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় যাইতেছি।" গোপাল বাবু বলিলেন, "না, একবারে শেষ ক'রে একত্রে বাসায় যাব।"

দিনমণি ধরাকে অনন্ত আঁধারে ডুবাইয়া দিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইলেন। সন্ধ্যা-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শ্মশানের উত্তপ্ত বায়ুকে শীতল করিতেছে—দিনের আলোক ক্রমে অন্ধকারের ক্রোড়ে লুকাইতেছে—শরৎ বিনয়কে বলিলেন, "দেখ বিনয়, প্রকৃতির কি সুন্দর ভাব, অন্ধকার আসিয়া কেমন আলোক্‌কে গ্রাস করিতেছে—বেশ মনোযোগ সহকারে দেখিলে, বোধ হয় যেন, অন্ধকার তরঙ্গ তুলিয়া আলোকের সহিত খেলা করিতেছে এবং উহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া আপনার শক্তি বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছে—ঘন হইতে ঘনতর—তীব্রতর আকার ধারণ করিয়া প্রকৃতির সমস্ত শোভাকে তাহাতে ডুবাইল—আর কিছুই দেখা যায় না—তখন বিনয়ভূষণ বলিলেন—শরৎ! এ সংসার হইতে একটি প্রেমপূর্ণ প্রাণ, ঐ দেখ আপনার নশ্বর দেহকে, ঐ চিতানলে ভস্মীভূত করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল—মহাপ্রাণে আত্ম সমর্পণ করিল—ঐ দেখ তাহার শেষ, ভস্মে পরিণত হইল—আঁধারে লুকাইল—প্রাণ মহাপ্রাণে—প্রেম মহাপ্রেমে—শক্তি মহাশক্তিতে ঢালিয়া দেওয়া যে কি সুখ, তা কে বুঝিবে? যে কখন এ মণিকাঞ্চনের যোগ বুঝে নাই—যাহার জ্ঞান সে মহাজ্ঞানকে ধারণা ক'রতে পারে নাই—সে কি বুঝিবে? লোকমুখে শুনিয়া, সাধুভক্তের জীবনে দেখিয়া কি, সে অন্তা যায়? কখনই না। আহা সরমা! তোমার অবিচলিত প্রেমের এক কনামাত্রের ও মূল্য আমার

নাই। তোমার প্রেম নিখুঁত—নিষ্কলঙ্ক—অটল—অচল, তাই তুমি এ সংসারের অপ্রেম ও অশান্তির ভার বহন করিতে পারিলে না—সুকোমল কান্তিপূর্ণ গোলাপ কতক্ষণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ সহ্য করিতে পারে—সুকুমারী কামিনী রজনীর অন্ধকারেই প্রেম বিতরণ করে—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে—প্রবাদ আছে, ডুমুরের ফুলও নির্জ্জনে রজনীযোগে খেলা করে ও প্রেম বিলায়, প্রকৃত প্রেমও ঠিক সেইরূপ নির্জ্জনে সঙ্গোপনে ফুটিয়া, চুপে চুপে প্রেম বিতরণ করিয়া, অনন্ত প্রেমে আত্মসমর্পণ করে—সরমার প্রেমও ঠিক্ সেইরূপ। কি কুক্ষণে সে লাবণ্যময়ী দেবী আমার মত হতভাগা পামরকে ভাল বাসিল—কি অশুভ মুহূর্ত্তে প্রেমের আগুণ জ্বালিল—সে আগুণ আর নিবিল না—বেচারা সেই আগুণে, আজ তিন বৎসর হইতে চলিল, পুড়িয়া পুড়িয়া, শেষে আজ ভস্মে দেহ মিলাইয়া পরমাত্মার রাজ্যে—যেখানে বহুসংখ্যক পুণ্যাত্মারা বাস করিতেছেন, সেই মঙ্গল-রাজ্যে গমন করিল। আমি হতভাগ্য তাই এমন ব্যক্তির আদর করিতে পারিলাম না। দেখ শরৎ! সময়ে সময়ে আমার মনে হয়, এই দেবীপ্রকৃতি প্রেমিকার প্রেমের সমাদর না করিয়া—ইহাকে আজ তিন বৎসর যে যন্ত্রনানলে দগ্ধ করিয়াছি—তাহাই বাহুরূপে আমার সুখ শান্তি হরণ করিতেছে—আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এই ললনার পবিত্র প্রাণে যে দুঃখ ও মর্ম্মবেদনার আগুণ জ্বালিয়াছিলাম, যাহা গভীর নিরাশার আকার ধারণ করিয়া নিরন্তর ইহাকে পোড়াইয়াছে—তাহাই আমার জীবনের সুখ শান্তি

হরণ করিয়া, আমাকে দুঃখের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—আমার ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে আবৃত করিয়া দিতেছে—ভাই, আমি আমার জীবনের সে' পথ আর দেখি না, যাহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, যেন একটি আবরণ আমার সম্মুখে পড়িয়া আমাকে আশার পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি—সে বাস্তবিকই আমাতে অনুরাগিনী, আমিও তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি এবং তাহাকে সুখী করিতে পারিলে, প্রাণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হই—কিন্তু তবুও যেন কি একটি জিনিসের অভাব দেখি—যাহা থাকিলে মানুষ মানুষে মগ্ন হয়—পরস্পর পরস্পরের নিকট ধরা পড়ে—পরস্পরেতে বিরাজ করে। এই জন্য আমার মনে হয় আমি আর অধিক দিন এ সংসারের কুহকে পড়িয়া থাকিব না, আমার ইচ্ছা হয়, আমি সেই দেশে উড়িয়া যাই, যে দেশে আমার এ প্রাণবিহঙ্গ নিত্যসুখ—নিত্যানন্দ ভোগ করিবে। যেখানে পার্থিব ভাবের বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাকে মলিন করিতে পারিবে না, আমার ইচ্ছা হয় আমার প্রাণ-পাখী সেই দেশে উড়ে যাক্। এমন সময়ে শুনিলেন অনতিদূরে নদীতটে কে গান করিতেছে :—"(হরি দয়াময় ব'লে) এই বেলা ডাক্, ডেকে নে ভাই, ডাক্‌বার সময় মিল্‌বে না।" গানটি মন দিয়া শুনিলেন, শুনিয়া অবসন্ন মন আরও অবসন্ন হইল। বিনয়-ভূষণ, শরৎচন্দ্র ও গোপাল বাবু শ্মশানের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আজ সরমার অভাবে গৃহ অন্ধকার—গৃহের শোভা সেই

বিধবা—আজ পরলোকের পথে দাঁড়াইয়াছেন—পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধুদের প্রাণে অতীতের স্মৃতি মাত্রে পরিণত হইবার আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। নিষ্ঠুর সংসারে এইরূপে ভাই ভগ্নীকে—ভগ্নী ভাইকে—পুত্র কন্যা, পিতা মাতাকে—পিতা মাতা, পুত্র কন্যাকে—পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে বিস্মৃতির অগাধ সলিলে ডুবাইয়া, প্রাণকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া সংসারারণ্যে অমৃত সুখ অনুসন্ধান করিতেছে। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, সেই বলিবে—আমি সুখের ভিখারী—অনন্ত সুখের ভিখারী—সুখের জন্য সব করিতে পারি—লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া -অপরের বুকে ছুরি বসাইয়া—অন্যের শান্তি হরণ করিয়া—যদি আমার এক বিন্দু সুখও হয়, তবে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। কেবল একজন নহে, সংসারের সর্ব্বত্র সুখকে মূলমন্ত্র করিয়া লোক কি না করিতেছে—যে কার্য্যে চির অশান্তি ও অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবার সম্ভাবনা—মানুষ সুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া আপনাকে তাহাতেও নিয়োগ করিতেছে, এবং পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতেছে। দুঃখ এই যে, সংসারের লোক দেখিয়াও দেখে না—ঠেকিয়াও শিখে না—বিপদে পড়িয়াও সাবধান হয় না। সাধু যিনি—সুচতুর লোক যিনি—তিনি আপনাকে অসহায় দেখিয়া জগতের কারণরূপিণী সেই মহাশক্তির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভব-বন্ধন মুক্ত হন।

সকলেরই প্রাণের জ্বালা কিছু পরিমাণে প্রশমিত হইল। মায়ের প্রাণের আগুন আর নিবিয়াও নিবে না—রাবণের চিতার ন্যায়, সে শোকাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

বিনয়ভূষণ, গোপাল বাবু, তাঁহার পরিজনবর্গ ও শরৎচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পথে কত চিন্তাই তাঁহার প্রাণে উদয় হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হয় না। তবে বিশেষ ভাবে সরমার কথাই তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার মনে হইতেছে, তিনিই সরমার অকাল মৃত্যুর কারণ—সেই যে রোগ শয্যাতে, আমি যন্ত্রণাতে অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতাম, আর সে আমার নিকটে বসিয়া, পাখার বাতাস করিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া ও মিষ্ট কথা বলিয়া, আমার পীড়িত শরীরের শান্তি বিধান করিত, সে প্রেমময়ীর প্রেম, কথায় কথায় প্রবাহিত হইয়া আমার রোগ-ক্লিষ্ট মনে শান্তি বর্ষণ করিত—আমি তাহা স্মরণ করিয়া যখন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম, তখন সেই যে সে ঈষৎ হাসিতে আলোকিত মুখ খানি লজ্জায় নত করিত এবং অল্পে অল্পে আমাতে তাহার প্রাণের আশা ভরসা স্থাপন করিতেছিল—তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। সে ত আর জানিত না, যে আমি তাহার প্রেমের উপযুক্ত আদর করিব না, আর আমি হতভাগা জানিতাম না, যে বায়ু-বিতাড়িত বিহঙ্গের ন্যায় বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিব। ছি! ভাবিলে আমারই উপর আমার বড় ঘৃণা হয়। তাহার মনুষ্যত্বের মূল্য কি, যে ব্যক্তি অকৃত্রিম প্রেমকে আদর করিতে না পারিল? সরমার কোন্ অপরাধে আমি অন্যত্র আত্মসমর্পণ করিলাম, ইহা আমারই বুদ্ধি ও মনের অতীত। আমার নিজ দুর্ব্বলতাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহারও অকাল মৃত্যু ঘটাইয়াছে—যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে শরৎ আর আমি নৌকায় উঠি, সেই যে

পত্র পাইলাম যাহাতে সে আমাকে শেষ দেখার প্রার্থনা জানাইয়াছে—সেই পত্রখানা আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিল—বুকে যেন শেল বিঁধিল—সরমার মৃত্যুতে আমার অর্দ্ধেক জীবন ক্ষয় হইল। আর কখন এই জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে কি না, জানি না। বিধাতা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সে দিনের কথা ভাবিতে, প্রাণ মরুভূমি হইয়া যায়, যে দিন আমার বিবাহ সংবাদ সরমার বক্ষে বজ্রের ন্যায় পতিত হইয়া, তাহার আশা ভরসা, সুখ শান্তি, চিরদিনের মত হরণ করিল—সেই দিন হইতেই তাহার রোগের সঞ্চার হইল। সে অল্পে অল্পে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার কবিরাজের কি সাধ্য আছে যে এ ভয়ানক রোগের প্রতিকার করে? জানি না, আমার ভাগ্যে কি আছে। আমার কিন্তু আর কিছু ভাল লাগে না। আমার এ ভগ্ন মনে কে শান্তি বিধান করিবে? এইরূপ অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে বিনয়ভূষণ কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং নিরূপিত দিন হইতে আফিসে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কি ভয়ানক ব্যাপার!

কালাচাঁদের শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মৃত্যু হওয়াতে, তাহার পিতা মাতা তাঁহাদের নববধূকে আপনাদের আলয়ে আনিয়াছেন। সমাজের রীতি অনুসারে বিবাহের পর কন্যা পূর্ণ এক বৎসর কাল পিতৃভবনে বাস করিবে। পিতা মাতার মৃত্যুর পর কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই অভিভাবক, তাঁহার সহিত কলহ করিয়া তাঁহারা বধূকে আপনাদের গৃহে আনিয়াছেন। বালিকার বয়স নয় বৎসর মাত্র—মেয়েটি অকলঙ্ক চাঁদ—কোন দোষ, কোন খুঁত নাই—বালিকাকে দেখিলে বোধ হয় ভবিষ্যতে তাহার জীবন অনেক সদ্গুণের আলয় হইবে। এই অল্প বয়সেই বালিকা তাহার ভাবী জীবনের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়াছে। বালিকা বালস্বভাবজাত সহজজ্ঞানে পরিচালিত হইয়া কালাচাঁদকে পছন্দ করে না—স্বামীর রূপ গুণ ও আচরণ কিছুই তাহার মনের মত নহে—একথা যদিও সে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই সত্য, কিন্তু সেই নবম বর্ষীয়া বালিকার মুখের দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে, সে মুখের স্বাভাবিক সরলতাকে কে যেন অপহরণ করিয়াছে। এই বাল্যাবস্থাতে পিতা মাতার স্নেহমমতা হইতে সে বালিকা চির-বঞ্চিত হইয়াছে—সহোদরের স্নেহ ভালবাসা হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে—যাহাদের গৃহে সে আসি-

য়াছে—কুপ্রথা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার সমবেত হইয়া সেখানে তাহাকে কি অবস্থায় ফেলিযাছে, তাহা চিন্তা করিতেও প্রাণে ক্লেশ হয়—সে শোচনীয় দৃশ্যে পাষাণও গলিবে। বালিকার পিতৃভবন অন্ধকার—যাহাকে লইয়া উত্তর কালে সুখী হইবে, তাহাকে একটি সং কি ভূত প্রেতের ন্যায় মনে করে—তাহার নিকটে যাইতেও রুচি হয় না। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট স্নেহ মমতা ও সদ্ব্যবহার পাওয়াই বালিকার শেষ সুখ—কিন্তু অচিরে তাহার সে আশাও নিবিয়া গেল।

যে আজ বালিকাস্বভাবসুলভ পূর্ণ স্বাধীনতার ক্রোড়ে বিচরণ করিবে—যে আজ সরল ও সুমিষ্ট আহ্বানে জনক-জননীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে—মা বাপের প্রাণে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিবে—যাহার শৈশবের সকল প্রকার আব্দার বিনা আপত্তিতে পূর্ণ হইবে—সেই সোহাগের ফুল—আদরের ধন—বালিকা আজ পরপদদলিত, তিরস্কৃত ও অপমানিত হইবার জন্যই যেন শ্বশুরগৃহে নীত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে যে পিতার সকল গৃহকে আপনার জানিয়া স্বাধীনভাবে এঘর ওঘর সকল ঘর ভ্রমণ করিয়াছে—আজ পরগৃহে—গৃহের এক প্রান্তে বধূবেশে সংরক্ষিত। যে বালিকা পিতৃগৃহে ক্ষুধার সময়ে মুখ-ফুটে মায়ের নিকট ক্ষুধার কথা বলিত, আজ সে পরগৃহে লজ্জার দায়ে এবং মন খুলে কথা কহিবার লোকাভাবে, পেটের ক্ষুধা গোপন রাখিয়া দিন দিন শীর্ণকায় হইতে লাগিল। কেহই এ বালিকার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহে। কেন এমন হইল? বালিকার কি এমন কোন অপরাধ আছে, যে জন্য সকলে তাহাকে বিরক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে?

না, তাহা ঠিক নহে। বালিকা ঠিক বালিকাই আছে—সে অকলঙ্ক চাঁদে এখন কোন কলঙ্কের দাগ পড়ে নাই। তবে কি বালিকা কোন অশুভ মুহূর্ত্তে শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয়াছে, যে জন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না? একথার উত্তর কে দিবে? পাঠক, আপনি কি সময়ের শুভাশুভ—সুক্ষণ, কুক্ষণ মানিয়া থাকেন? সময়ের এমন কোন শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু মানুষ কখন কখন মানুষের কুদৃষ্টি কিম্বা সুদৃষ্টিতে পড়িয়া থাকে, একথা সত্য—একজন একজনকে দেখিবা মাত্র ভালবাসিল, আবার একজনকে দশ দিন দশটি ভাল কাজ করিতে দেখিলেও প্রেমের চক্ষে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু এরূপ ব্যাপার অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছেন। এখানেও তাহাই হইয়াছে, বালিকা তাহার শ্বাশুড়ীর বিষনয়নে পড়িয়াছে। বালিকাবধূর বসা দাঁড়ান, খাওয়া পরা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই শ্বাশুড়ীর অসন্তোষ ও অতৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। শ্বাশুড়ী কথায় কথায় লোকের নিকট পুত্রবধূর কুৎসা করিয়া বেড়ান, ক্রমে সকলেই বৌকে কুদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। শ্বাশুড়ীর এরূপ ব্যবহারের কারণ বোধ হয় সহজে কেহ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই, সকলে এই নিরপরাধিনী বালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে দেখিতে লাগিলেন। কালাচাঁদ যতই অপদার্থ হউক না কেন, তাহার মায়ের নিকট সে পদার্থবান রত্ন বিশেষ। তাঁহার পুত্ররত্নকে পুত্রবধূ যে পছন্দ করে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার

সন্তান ও তাঁহার পুত্রবধূ দুই ভিন্ন বস্তু—এ দুইজনের মিলন সম্ভব নহে। তাঁহার বধূ যে অনেক সদ্‌গুণের ও সৌন্দর্য্যের অবিকশিত পুষ্প-কলিকা তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সময়ে লোক পুত্রবধূর আচরণে মুগ্ধ হইয়া, পাছে বলে, অপাত্রে কন্যা ন্যস্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করে—পাছে তাঁহাদের প্রতি, তাহাদের পুত্রের প্রতি, লোকে দোষারোপ করে তাই পূর্ব্ব হইতে আপনাদের ও সেই অযোগ্য পুত্রের সুনামের পথ পরিষ্কার রাখিতে উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। যে যে উপায়ে শাশুড়ী আপনার অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্নবতী, তাহা সম্পূর্ণরূপে সুবিধাজনক হইতেছে না দেখিয়া, তিনি আরও একটু গুরুতর নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করিলেন। শাশুড়ী ক্রমশঃ আপন কুবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া তাঁহার বালিকাবধূর নামে হাঁড়িতে খাওয়া, মাছ চুরি করিয়া খাওয়া, কড়া হইতে দুধের সর চুরি করিয়া খাওয়ার অপবাদ রটাইতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বধূকেও নানা প্রকার গঞ্জনা দিতে ও তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। বালিকাবধূর উপর এই সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়া এবং এই বিবাহটিতে অনেক প্রবঞ্চনা ও চাতুরী করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া, প্রেমমালার পিতা সহোদর হইতে পৃথক হইলেন। তিনি দেখিলেন তাহার গৃহে এমন সকল নীচ ও অধম কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে, পারিবারিক শিক্ষা কলুষিত হইবে—নীতি ও শান্তির অভাব হইয়া পড়িবে। পরিবারের এরূপ অবস্থাকে তিনি সর্ব্বদা ভয়ের চক্ষে দেখেন, সুতরাং

ভ্রাতা হইতে পৃথক হওয়া ভিন্ন,তাঁহার আর কোন উপায় নাই। তিনি পৃথক হইলেন, বালিকার উপর অত্যাচারের মাত্রাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। অভাগিনী বালিকার চক্ষের জল ফেলিয়া মনের কথা বলিবার, প্রেমমালা ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই। যখন যে কথাটি হয়, প্রাণের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া স্নেহের ননদিনীর নিকট প্রকাশ করেন। প্রেমমালা বালিকার ভাবী মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে দুঃখ কষ্টের পরিমাণ এত বাড়িল, যে আর সহ্য হয় না—জীবনের এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে যায় না—দিবানিশি হৃদয়ের অন্ধকার গুহায় লুকাইয়া মনের ক্লেশ ও অশান্তি স্মরণ করেন এবং চক্ষের জলে ভাসিয়া থাকেন। নির্জ্জনে একাকিনী চক্ষের জল ফেলাই তাঁহার পরম সুখ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন কাটিবে ? দিন আর যায় না। সে একদিন মনের আক্ষেপে—প্রাণের যাতনায়—চারিদিক আঁধার দেখিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করার সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। কেমন ক'রে গলায় দড়ি দেয়, তাহা জানে না, অথচ চুপে চুপে কালাচাঁদের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে—একখান চৌকির উপর একখান টুল তুলিয়া ঘরের আড়াতে কাপড় বাঁধিয়াছে—একটা ফাঁস তৈয়ার করিয়া গলায় লাগাইয়া দিয়াছে, এমন সময় প্রেম-মালা বোউকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র বোউকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোথাও পান নাই—শেষে সেই ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছেন বোউ ঘুমাইয়াছে কি না। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা দেখিতে পাইলেন, ঘরের ভিতর এক

ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। প্রেমমালা সহসা গোল না করিয়া বৌউকে আস্তে আস্তে ডাকিলেন, বৌউ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইবার স্থান সেই টুল খানি পা দিয়া ফেলিয়া দিল। পরক্ষণেই আবার প্রেমমালার মিষ্ট আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া দরজা খুলিয়া দিতে ইচ্ছা কবিল, কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিল না। প্রেমমালা বিপদ দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন,বৌউ গলায় দড়ি দিয়াছে! কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে, বাড়ীর সকলে একত্রিত হইল—অবিলম্বে গৃহের দ্বার ভগ্ন করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, বালিকা তখনও ছট্‌ফট কবিতেছে! কিন্তু সেই কাপড় কাটিয়া নামাইতে নামাইতে, সে হাত পা নাড়া বন্ধ হইল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জড়তা প্রাপ্ত হইল। গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল—কেহ বলে মরিয়াছে, কেহ বলে না, এখনও মরে নাই—মরিলেও তখন একটা জনরব তুলিয়া দিল যে, মরে নাই—তৎপরে আর বাহিরের লোক আসা বন্ধ করিয়া দিল। সেই গ্রামের কিছু দূরে একজন ডাক্তাব থাকেন, তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। ইতিমধ্যে অনেক রকম মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে লাগিল। যাহারা নিকটে থাকিয়া বালিকাব চৈতন্য সম্পাদনের প্রয়াস পাইতেছে, তাহারা একবার একটু ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে কবিতেছে—বুঝিবা বাঁচিবে, আবার ভাবিতেছে, শেষ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আশা নিরাশা ও সন্দেহের ভিতর দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল কাটিল, এমন সময়ে ডাক্তার আসিলেন। অনেক পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, এখনও প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই, কিন্তু এমন অবস্থায়

রোগী প্রায় বাঁচে না, আশা নাই, তবু চেষ্টা করা আবশ্যক। অনেক চেষ্টার পর চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র ; আবার অচেতন হইয়া পড়িল। এইরূপে সে দিন কাটিল। পরদিন প্রাতে চেতনা হইল বটে—কিন্তু জ্বর হইয়াছে। এই জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রেমমালা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্নেহেব বোউকে কোলে কবিয়া বসিয়া আছেন—দিন যাইতেছে—বাত্রি যাইতেছে—তাঁহাব পরিশ্রমেব বিরাম নাই—প্রাণ মন ঢালিয়া বোউএর সেবা করিতেছেন। বিকার-প্রাপ্ত রোগী কত মতে মনের ক্ষোভ জানাইয়া ও বিকারেব বিক্রম দেখাইয়া, অবশেষে একাদশ কি দ্বাদশ দিবসে, এই নিষ্ঠুর সংসারেব যন্ত্রণাব হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, অনন্ত ধামের পথে অগ্রসর হইল। বালিকা সেই রাজ্যে চলিয়া গেল, যেখানে তাহাব জনক জননী সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছেন বালিকাব হাড়ে বাতাস লাগিল—বালিকাব প্রাণ জুড়াইল !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এ কি সেই লোক ?

ভগ্ন মন ও রুগ্ন শরীরে বিনয়ভূষণ আবার কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরীরের শক্তি ও মনের বল তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতেছে—লোক উৎসাহ ও উদ্যম-বিহীন হইয়া কোন কাজ করিতে গেলে, তাহার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। এইরূপ উদাসীন ভাবে কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রেম-মালার পত্রে কালাচাঁদের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ও আনুসঙ্গিক অনেক পারিবারিক রহস্য জানিতে পারিয়া, মনটা আরও চঞ্চল ও উদাসীন হইল। সরমার মৃত্যু এবং তজ্জনিত দারুণ মর্ম্মবেদনা—তাহার উপর আবার এই নিরপরাধিনী বালিকার আত্মহত্যা বিনয়ভূষণের মনকে বড় হতাশ করিল। মনের দুঃখে বিনয়ভূষণ দিন দিন শরীর মনের শক্তি হারাইতে লাগিলেন,—গভীর চিন্তার গুরুভার বহনে ক্রমে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পূজার ছুটী আসিল ;—বিনয়ভূষণ গৃহে যাই-বার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিনয়ের জননী পুত্রবধূকে আবার গৃহে আনিয়াছেন। পূজার ছুটি হইবে—বিনয়ভূষণ বাড়ী আসিবে—বৃদ্ধার কত আনন্দ! ক্রমে সে আন-ন্দের দিন নিকটতর হইল। প্রেমমালা স্বামী সন্দর্শন লালসায় পথ তাকাইয়া আছেন।—মনে কত কথাই জমিয়াছে—প্রাণের বন্ধুকে নিকটে পাইয়া, প্রাণের কবাট খুলিয়া কত কথা বলি-

বেন! স্নেহের প্রতিমা ভগ্নী মনোরমাও দাদাকে দেখিবেন—কত কথা বলিবেন—কত উপদেশ লইবেন—ভাইএর সেবা করিয়া—ভাইকে ভাল বাসিয়া, কৃতার্থ হইবেন—তিনিও পথ তাকাইয়া আছেন। অন্ধের চক্ষু—দরিদ্রের ধন—বৃদ্ধার এক-মাত্র অবলম্বন—বিনয়ভূষণকে দেখিবার জন্য—মা চক্ষুদুটিকে পথে ফেলিয়া রাখিয়াছেন; এমন সময়ে বিনয়ভূষণ বাড়ী আসি-লেন। বাড়ী আসিলেন বটে, কিন্তু সে মানুষ আর আসিল না, যে আগে আগে আসিত! শুষ্ক দেহ, শুষ্ক মন প্রাণ লইয়া, যেন একজন পথের পথিক কোথাও যাইতেছে—দুই একদিন থাকিয়া যাইবে বলিয়া আসিল! সে সরস হৃদয—সে মুখের কান্তি চিরকালের জন্য ডুবিযাছে—আর আসিবে না—কেন এমন হইল? কে বলিবে? বিনযের মনের রোগ ত কেহ জানে না। প্রেমমালা বিনযকে দেখিযা অবাক্। তিনি ভাবিলেন, "এ কি সেই লোক?" মনোরমা—ভগ্নী—অবাক হইয়া, দাদার গায়ে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠি-লেন! মা ত ছেলেকে দেখিয়া চিনিতে পারেন না—ছেলের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকলেরই মনটা কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িল! তথাপি সেই শুষ্কতার ভিতর, সেই নিরাশার ভিতর—সেই দুঃখ কষ্টের ভিতর—একটু আনন্দের রেখা পাত হইল—ক্রমে প্রসন্নতা পরিচায়ক এক আধটি কথা পর-স্পরের মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়াছে, এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিনয়ভূষণ ও মনোরমা দুই ভাই বোনে বসিয়া আছেন, কত কথা বলিতেছেন—কথায় কথায় বিনয়ভূষণ

ভগ্নীকে বলিলেন, "দেখ মনো, তোমার জন্য সর্ব্বদাই আমার ভাবনা হয়—কি করিলে তোমাকে সুখী করিতে পারি, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। তুমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছ—যে উন্নতি করিয়াছ তাহা যথেষ্ট নহে। আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাই, তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করি, তোমার দুঃখের জীবন যাহাতে সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হয়, তাহার উপায় করি। কিন্তু আমার শরীর সুস্থ না হইলে, আমার কর্ম্ম কাজের ভাল বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে আর তোমাদের কাহারও কোন উপকারে আসিতে পারিব না। দেশাচারের হাত হইতে মুক্ত করা প্রার্থনীয় হইলেও, তাহা আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। তোমাকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া, পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীগণের প্রিয় করিতে পারিলেও আমার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-লাভ হয়। তুমি নিজে তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া তদনু-সরণে সক্ষম হও, ইহাই আমার কামনা। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তুমি সুখী হও। তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা সময়ে সময়ে আমাকে অধীর করিয়া তুলে।" মনোরমা বলিলেন, "দাদা, তুমি সুস্থ শরীরে আনন্দিত মনে সংসার-সুখ ভোগ করিতেছ দেখিলে, আমার বড়ই সুখ হইবে—আমি চির দিন তোমার ও তোমার ছেলে মেয়ে হ'লে, তাদের সেবা করিয়া জীবন কাটাইতে পারিলেই পরম সুখ বোধ করিব। আমার এ পোড়া জীবনে এইটুকু হইলেই হইল।" "আমার এ পোড়া জীবনে এইটুকু হইলেই হইল" এই কথা কয়টি শেলের ন্যায় বিনয়ভূষণের

প্রাণে বিদ্ধ হইল, তিনি কোন কথা না বলিযা আস্তে আস্তে দুই ফোটা চক্ষেব জল ফেলিলেন—কেহ তাঁহাব সে চক্ষেব জল দেখিল না—কেহ তাঁহার মনেব ক্ষোভও বুঝিল না। কেবল মনোবমাই বুঝিলেন যে, তাঁহাব নিবাশ জীবনেব বিষণ্ণতার গভীবতা দাদাই কেবল বুঝিতে পাবিযাছেন। ক্রমে বাত্রি অনেক হয দেখিযা বিনযভূষণ মনোবমাকে অতি মিষ্টভাবে বলিলেন—"মনোবমা, দিদি, বাত্রি অনেক হইল, শোওগে যাও, আমিও শুইগে। যদি ভাল কবিয়া দাঁড়াইতে পাবি, তবে যে সকল সাধ মনে আছে, তাহা পূর্ণ কবিব।"

বিনয়ভূষণ এইরূপে পূজাব ছুটীটি বাড়ীতেই শেষ কবিলেন, আব দুই এক দিন মাত্র বাড়ীতে আছেন, এমন সময়ে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাব শবীব ক্রমশঃ খাবাপ হইতেছে, বৈকালে একটু জ্বেবে মতন হয়—আহাবাদিও কবেন। ক্রমে কলিকাতা যাইবাব দিন উপস্থিত হইল। শবীবেব অবস্থাটা তত ভাল নয বলিয়া তিনি কলিকাতা যাইবাব সময়ে একবাব মনোহবগঞ্জ হইযা যাওয়া স্থিব করিলেন। তথায় নাবালকদের ম্যানেজার বাবুব সহিত দেখা করিয়া এবং ডাক্তাব সাহেবকে শরীরের অবস্থাটি জানাইয়া পবামর্শ লইবেন বলিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজাব বাবু পূর্ব্বে বিনযভূষণকে দেখিযাছিলেন এবং শবতেব বন্ধু বলিয়া জানিতেন, সুতবাং বিশেষ আদব ও যত্নেব সহিত তাঁহাকে গ্রহণ কবিলেন। বিনযভূষণকে সঙ্গে লইয়া নিজে ডাক্তার সাহেবের বাসাতে গেলেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত বিনযভূষণকে দেখিতে অনুবোধ কবিলেন। ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ ধবিয়া পরীক্ষা কবাব পর বলিলেন,

''শরীরের অবস্থা ভাল নহে, এখন হইতে সাবধান না হইলে এবং রীতিমত ঔষধ সেবন না করিলে, জীবন সংশয় হইয়া উঠিবে।'' ম্যানেজার বাবু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার সাহেব বলিলেন, শরীর শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে—আর প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া পীড়াকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে—এ অবস্থায় কর্ম্ম করিতে গেলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ যুবক মারা যাইবে। আপনি ঐ যুবককে তিন মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী যাইতে ও ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিতে বলুন। ম্যানেজার বাবুর পরামর্শে বিনয়ভূষণ তিন মাসের বিদায়ের আবেদন পাঠাইয়া ও ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

প্রেমমালা কিছু দিনের জন্য পিতৃভবনে গিয়াছেন। এবার এত শীঘ্র পিত্রালয়ে যাওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার সন্তানাদি হওয়ার সম্ভাবনা শুনিয়া তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে কুসুমপুরে আনাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিনয়ভূষণ জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেমমালাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছেন। প্রেমমালা কয়েক মাস পিত্রালয়ে আছেন—পিতা মাতার স্নেহ মমতা ও সময়োপযোগী সকল

প্রকার যত্নে কালাতিপাত করিতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রাণে যে কি গভীর ক্ষোভ ও মনোবেদনার লুক্কায়িত অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে—তাহা কে বুঝিবে—কে তাহার প্রকৃত পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবে? প্রেমমালা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়—নিরাশময়। মনের সুখে তাঁহার একটি দিনও যায় না। এইরূপে দিনগুলি একটি একটি করিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পৌর্ণমাসী রজনীর শেষ ভাগে শশধর-ক্রোড়ে শুকতারা যেমন শোভা বিস্তার করিতে না করিতে অনন্ত আকাশ পটে মিলাইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ প্রেমমালার স্নেহক্রোড় নবকুমারে সুশোভিত হইতে না হইতে—তাঁহার ভাবী নিরাশা ও দুর্ভাবনার গভীর অন্ধকারে আশা ও আনন্দের আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে—আত্মীয় স্বজনের মুখমণ্ডলে হাসির উদয় হইতে না হইতে, সকলই অন্ধকারে ঢাকিল—অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইল—ষষ্ঠ দিবসে শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা গেল। এ নিদারুণ যাতনা প্রেমমালাকে অত্যন্ত অধীর করিয়া তুলিল—তিনি নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির মধ্যে, একটি সান্ত্বনার ধন পাইতে না পাইতে, হারাইলেন—উন্মাদিনী প্রেমমালা আজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আজ প্রাণের স্বামীকে—শয্যাগত পীড়িত স্বামীকে, নানা প্রকার অভাবের মধ্যে, আনন্দের সংবাদ দিয়া কোথায় সুখী করিবেন, তা না হইয়া বিধাতার বিধানে এই হইল যে, নবকুমারের আগমন ও প্রত্যাগমন সংবাদ একত্রে লিখিয়া শোকের পরিমাণকে, দুঃখ কষ্টের পরিমাণকে শত

গুণে—সহস্র গুণে বাড়াইয়া দিলেন! বিনয়ভূষণ শুনিলেন যে,তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ছয়দিন মাত্র এসংসারে ছিল। যখন এই সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি শয্যাগত—উত্থানশক্তি রহিতপ্রায়;—এ ঘটনাও তাঁহার পীড়ার প্রকোপকে আরও একটু তীব্রতর করিয়া দিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রায় দুই মাস হইল বিনয়ভূষণ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একদিন ভাল থাকেন—আবার জ্বর হয়। শরীরে এক বিন্দু শক্তি নাই—শরীর অবসন্ন, শুষ্ক ও ক্ষীণ। চক্ষু শাদা হইয়া গিয়াছে—দেখিলেই বোধহয় রক্তের লেশমাত্রও নাই—পেটে পেটজোড়া পীলে ও যকৃৎ—আহারে রুচি নাই—যতই দিন যাইতেছে—বিনয়ভূষণ ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন ও জীবনের আশাও ত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু নিজের শরীর ও মনের অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না; লোক দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিবার তাহাই বুঝিতেছে। তাঁহার দুই একটি বন্ধু—বিশেষ ভাবে শরৎ ও গোপাল বাবুই কেবল বিনয়ের অবস্থা অবগত আছেন। বিনয়ভূষণ জননীর নিকট কোন কথাই প্রকাশ করেন না। তিনি জানেন, যে তাঁহার মায়ের একমাত্র আশা ভরসা তিনিই। যখন তাঁহার সামান্য অসুখও মায়ের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয়, তখন রোগের প্রকৃত অবস্থা মা জানিতে পারিলে যে একবারে পাগলিনী হইবেন, ইহা তিনি জানিতেন। স্নেহের ধন, ভগিনী, মনোরমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার প্রাণে যে কি দারুণ যন্ত্রণার আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা আর বলিবার নহে। মনোরমা, বালিকার বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া এই

সবে মাত্র যৌবনের নূতন জীবনে পদার্পণ করিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, তাহার আশা ভরসা-বিহীন জীবনে, যে সকল দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে বিষণ্ণতাভাবে অবসন্ন মুখের দিকে তাকাইলেই, বোধ হয় যেন, এক স্বর্গীয় শক্তি ভিতরে থাকিয়া তাহাকে ধীর, শান্ত ও সেবাপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে। তবুও জীবন সংগ্রামে সে বালিকা কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, এই চিন্তা বিনয়কে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তিনি কোন কথাই ভগ্নীকে বলেন না, কেবল সময়ে সময়ে নিকটে ডাকিয়া দুটি মিষ্ট কথা বলেন, একটু সদ্ভাব—একটু সহানুভূতি ও আদর দেখাইয়া থাকেন। এই রূপে রোগীর দিনগুলি একটি একটি করিয়া চলিয়াছে—তিনিও পীড়ার ভারে আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইতেছে না, তথাপি বিনয়ভূষণের পীড়ার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। শেষে এমন অবস্থা ঘটিল যে ডাক্তার সাহেব রোগীর আরোগ্য হইবার আশা ত্যাগ করিলেন—তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বিনয়ভূষণ অনতিকাল মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিবেন, তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

কেন এমন হইল? এ আশায় নিরাশা—সুখের দ্বিপ্রহর সহসা দুঃখের সন্ধ্যাতে পরিণত কেন হইল? বিনয়ভূষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর অধিক দিন তাঁহাকে এ রাজ্যে থাকিতে হইবে না। প্রভাতের পর প্রভাত—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর আসিবে ও

যাইবে—বসন্তের সুমন্দ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতিকে মধুময় করিবে—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে চারিদিক্ অগ্নিময় হইবে—বর্ষার অজস্র ধারা বর্ষিত হইয়া উত্তপ্ত ধরাকে শীতল করিবে—বিচ্ছেদ-জনিত বিরহে প্রণয়ীজনের প্রাণকে পোড়াইবে—শরতের শশধর আবার নীলাকাশতলে আপনার শুভ্রকান্তি বিস্তার করিবে—হেমন্তের শিশিরবিন্দু কণায় কণায় বর্ষিত হইয়া বৃক্ষ ও লতাকুলকে স্নান করাইবে—প্রাতের নবদূর্ব্বাদল-শিরে মুক্তাপাতির ন্যায় শোভা পাইবে—কেহ বা প্রস্ফুটিত পুষ্পদল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে—এ সকলই হইবে, কিন্তু বিনয়ভূষণের অদৃষ্ট চক্র এই শীতের শেষে আর ঘুরিবে না—তাঁহার জীবন্ গতি শেষ হইয়া আসিয়াছে—ক্রমে তিনি ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয়ভূষণের মনের ইচ্ছা যে, এই বেলা একবার প্রেমমালাকে আনাইলে ভাল হয়—একবার জনমের মত দেখা করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন—মনের ইচ্ছা এই যে একটি বার একাকী নির্জ্জনে প্রেমমালার নিকট বসিয়া প্রাণের দুএকটি কথা বলিয়া যান, কিন্তু এখনও তাঁহাকে আনিবার কোন কথাই উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া তিনি নিজেই মনোরমার দ্বারা কথাটি তুলিলেন। কথাটি উঠিবামাত্র সকলেই বুঝিতে পারিলেন, যে যত শীঘ্র সম্ভব একবার তাঁহাকে আনা আবশ্যক। প্রেমমালাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির বিকৃতি।

অন্ধকার রাত্রি—কেবল অন্ধকার নহে—আকাশে একটু একটু মেঘ আছে—দেখিলেই বোধ হয়, যেন রজনী কাহারও বিচ্ছেদে শোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে,—রজনী মলিনা—কে যেন বলপূর্ব্বক রজনীর উপবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রস্ফুটিত নক্ষত্র-ফুল গুলিকে অপহরণ করিয়াছে—কচিৎ একটি নক্ষত্র যেন প্রাণের ব্যাকুলতাতে পরিচালিত হইয়া এক একবার খণ্ডে খণ্ডে ভ্রাম্যমান মেঘমালার মধ্য হইতে উকি মারিতেছে—আবার একখণ্ড মেঘের স্বেচ্ছামত সঞ্চরণের পশ্চাতে লুকাইতেছে—একে অমাবস্যার রাত্রি, তাহাতে আবার একটু একটু মেঘ আছে; এই ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটি লোক চুপে চুপে আপনার গৃহদ্বারে আসিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিল। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে গৃহাভ্যন্তর হইতে জনৈক স্ত্রীলোক গৃহের কবাট খুলিয়া দিলেন। বাহিরের লোক গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারটি পুনবায় পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল, গৃহকর্ত্রী শশব্যস্তে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শুনিলে? কোন বিষয়ের কিছু সন্ধান কি পাইলে?” আগন্তুক হৃদয়ভূষণ ভগ্ন-হৃদয় ও বিষণ্নমনে শয্যাতে শয়ন করিলেন, তখন তাঁহার নবীনা গৃহিণী আকুল হৃদয়ে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং সকাতরে বলিতে

লাগিলেন, "তোমার একটু বিবেচনা নাই, তোমার অবস্থা দেখে আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, তোমার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কথা কও না কেন, বল না, কি শুনিলে? লোক কথায় বলে, 'যার জন্যে করি চুরি সেও বলে চোর', আমার তাই হয়েছে, আমি তোমার মন পাবার জন্য কত কষ্ট, কত অসুবিধা ভোগ করিতেছি—শাশুড়ী ননদের কত গঞ্জনা ভোগ করিতেছি—তোমার জন্য তাহাদের সঙ্গে কত কলহ করিতেছি—তোমার সুখ ও শান্তি বিধানের জন্য এমন কাজ করিয়াছি—যাহা মানুষে করে না—যাহা চিরদিন আমার কলঙ্ক হইয়া থাকিবে, তবুও কি তোমার মন পাইব না? আমার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই—শাশুড়ী ননদ শত মুখে গালি দিচ্ছে—তবুও যদি তোমার মন না পাই, তবে আমি কোথায় যাইব—আমার ত আর কেউ নেই—এত দুঃখ কষ্ট পাইয়াও যদি তোমার মন পাইতাম, তুমি যদি আমার হ'তে, তা হ'লেও আমার কতকটা দুঃখ দূর হ'তো —তা পোড়া কপালে, তুমি আমার দুঃখের ভাগ নিলে না—আমার সুখেরও কারণ হ'লে না—আজ তুমি যদি মন খুলে কথা কবে, তা হ'লে আমার কিসের দুঃখ।" হৃদয়ভূষণ নিরুত্তরে স্ত্রীর কাল্পনিক বিলাপ ও রোদন মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছেন, এখন হৃদয়ভূষণের মন কি ভাবে পূর্ণ? তিনি ভাবিতেছেন। "এক জনের কতকগুলি ক্ষুদ্র আব্দার পূর্ণ করিতে গিয়া, পরিবারস্থ কতকগুলি লোকের যৎপরোনাস্তি ক্লেশের কারণ হইয়াছেন—এই কাল্পনিক ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া—ইহার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া, ভাই ভগ্নী ও বিমাতার প্রতি আরও

কত অত্যাচারই বা করিতে হয়! ইহাদিগকে লইয়া সুখে বাস করিতেছিলাম, ইহারই আগমনে আমি তাহাদের পরম শত্রু হইলাম—ইহারই কুপরামর্শে ভগ্নীর প্রতি অত্যাচার করিলাম ও জননীর অশ্রুপাত করাইলাম—ইহারই কুমন্ত্রণাতে অমন গুণের ভাইটিকে পর করিলাম—জানি না—এই কুটিলা স্ত্রীর কুমন্ত্রণাতে আরও কত ভয়ঙ্কর কাজ করিতে হইবে। আর না—আর সহ্য হয় না—ইচ্ছা হয় এখনই গিয়া বিনয়ের গলা জড়াইয়া কাঁদি—এখনই মায়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদি—আর পারি না—আমার প্রাণ রি রি করিয়া জ্বলিতেছে—কিন্তু তাইবা কি করিয়া করিব, যাহাকে লইয়াই সুখ—যে আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো—আমার আশা ভরসা—বর্ত্তমানের সুখ শান্তি ও বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, তাহাকে অসুখী করিয়া আমিত এক নিমেষের জন্যও আরাম পাব না—যাহার হাসিতে আমি হাসি—যাহার মুখ ভার দেখিলে, আমার প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাহাকে কি করিয়া চটাইব—তাত হবে না—সকল ন্যায়ান্যায়ে অন্ধ হইয়া ইহারই মনস্তুষ্টি সাধনে রত থাকিব—আমার উপায়ান্তর নাই"—এই ভাবিয়া সেই অশ্রুজলে ভাসমানা গৃহিণীর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য বিধিমতে স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ইহাই তাঁহার সুখ—ইহাই তাঁহার শান্তি—জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এই রূপেই কাটিবে। স্বামীর একটু সদ্ভাব দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল না, কি শুনিলে?"

হৃদয়। মাকে কাঁদিতে শুনিলাম, আর মনোরমা আমাকে ও তোমাকে কত মন্দ বলিতেছে।

স্ত্রী। পোড়া কপাল তার, অমন না হলে সে বিধবা হয়ে

থাক্‌বে কেন—মুখ দেখ্‌লে গা জ্বলে যায়—বিধাতা যেন হাসি কেড়ে নিয়েছে—যখনই দেখ, তখনই মুখ যেন গোঁজ। আর কি শুন্‌লে?

হৃদয়। আর ডাক্তার ব'লে গেছে যে বিনয় বাঁচ্‌বে না। মুখে ঘা হয়েছে—এই কথাটা শুনে অবধি আমার প্রাণটা কেমন কর্‌ছে।

স্ত্রী। মনে মনে বলিলেন, "মন্দ কি, বিষয়টি সমস্তই ত আমার ছেলের হবে," প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাই বুঝি অমন ক'রে মুখ ভার ক'রে ছিলে? তা মরা বাঁচা ত আর মানুষের হাত নয়, যে যাবার সে যাবে, তাতে আর তোমার হাত কি? হৃদয়ভূষণ এই কথা শুনিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া উঠিলেন—তাঁহার বোধ হইল যেন, কাল সর্পের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ঘৃণা হইল, ভয়ও হইল, অথচ স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে সাহস হইল না। পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন প্রকৃতির বিকৃতি কতদূর হইতে পারে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন কি সত্য হইবে ?

একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বৌউ আসিয়াছেন, নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে। সংবাদ শুনিবামাত্র মনোরমা ও তাঁহার মা দুই জনেই দৌড়িয়া ঘাটে গেলেন। প্রেমমালা শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া ননদিনীর নিকট দাঁড়াইলেন, তাঁহারা বধূকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—প্রেমমালা ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু পশ্চাৎপদ হইয়া স্নেহের ননদিনীর নিকট স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হইল—মনে মনে ভাবিলেন, তবে কি আমার পুরাতন স্বপ্ন সত্য হইল ? ভাবিতে প্রেমমালার মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন, কোন রকমে আত্মসম্বরণ করিয়া গৃহে আসিলেন। কত চিন্তা যে একে একে তাঁহার প্রাণে উদয় হইয়া লয় পাইতেছে, তা কে বুঝিবে ? কোথায় আজ সুকোমল কুসুমকান্তি—নবকুমারে ক্রোড়সুশোভিত করিয়া শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিবেন—কোথায় আজ হাসিভরা মুখে শিশুসন্তানকে ননদিনীর ক্রোড়ে দিবেন—ননদিনী আবার স্নেহের ধন—শিশুকে তাহার ঠাকুরমায়ের কোলে দিবে—কোথায় দুঃখের দিনে—নিরাশার দিনে, সুখ ও আশার বিজলী খেলিবে ; কিন্তু তাহা হইল না—প্রেমমালা আঁধার প্রাণ লইয়া আঁধার গৃহে প্রবেশ করিলেন—চক্ষে জল

আসিল—আবার চক্ষেই শুকাইল। শ্বাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! বড় অসময়ে তোমাকে আনিলাম, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী—আদরেব ধন হইলেও, অনেক কষ্ট পাইবে—আমাব মনেব অবস্থা বড় খারাপ—মাথাব ঠিক নেই, কোন অযত্ন হ'লে কিছু মনে ক'বো না—নিজের ঘর, যেমন ভাল' বুঝিবে সেইরূপ করিবে—সকল কথা সকল সময়ে আমার মনে থাকে না। প্রেমমালা নতমস্তকে শ্বাশুড়ীব কথাগুলি শুনিতেছেন, এমন সময়ে মনোরমা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বোউ, এস, আমরা ঐ ঘরে যাই।" শ্বাশুড়ীও তাতে সায় দিয়া বলিলেন, "যাও মা, ঐ ঘরে গিঁয়া একটু ব'সগে।" গৃহিণী বধূকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া, নিজেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তবে গেলেন। প্রেমমালা যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কি দেখিবেন—কি শুনিবেন ভাবিয়া, প্রাণ অধীর হইয়া পড়িয়াছে—মুহূর্ত্তকাল বিলম্বও সহ্য হইতেছে না—ভাল লাগিতেছে না—বায়ু-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় অবিরাম কম্পিত হইতেছেন—প্রাঙ্গনের দূরত্ব যোজনান্তর বলিয়া বোধ হইতেছে—মুহূর্ত্তকে শত বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে—মনের এমন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রেমমালা বিনয়ের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন—পা আর চলে না—মন আর সরে না—প্রাণে কেহ আর আশার কথা বলে না—চারিদিক নিরাশার ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন—ননদিনী হাত খানি ধরিয়া প্রেমমালাকে আস্তে আস্তে দাদার নিকট লইয়া গেলেন—তিনি আনত বদনে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনয়ভূষণ আস্তে আস্তে বলিলেন, "প্রেমমালা এসছ? একবার

কাছে এস—তোমাকে দেখি, কই তুমি ? দূরে কেন, নিকটে এস না ?" প্রেমমালা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। মনোরমা দাদার ও বৌউএর মনের অবস্থা দেখিয়া বড় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন—তিনি থাকিবেন কি সরিয়া যাইবেন, ছেলে মানুষ তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারেন না—অবশেষে কে যেন তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল—পাদুখানি আপনা-পনি চলিল—তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয়ভূষণ আর কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, প্রেমমালাও তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। কে কি ভাবিতেছেন কেহ কি বলিতে পারে ? অনন্ত প্রসারিত রত্নাকরবক্ষ কত গভীর কে বলিতে পারে ? প্রেমের কণামাত্রে আবদ্ধ দুটি প্রাণের আত্মীয়তাও যে সেইরূপ কত গভীর, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? অনন্ত আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান নক্ষত্রমালা যেমন অগণ্য, ঠিক সেইরূপ প্রেমের রাজ্যে কখন্ কত যে সুন্দর নক্ষত্রফুল ফুটিয়া থাকে, তাহা কে গণনা করিবে ? কাহার সাধ্য প্রেমের জলধির পরিমাণ করে—কাহার সাধ্য সে জলধিতলে লুক্কাইত রত্নকণা সকল সংগ্রহ করে ? তিনিই কেবল কিছু কিছু জানেন, যিনি আপনার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উদিত ভাবনিচয় অন্য হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত দেখেন—আপনার হৃদয়োৎপন্ন প্রেমালোকে অন্যের প্রাণকে আলোকিত করিয়া থাকেন। প্রখর সূর্য্য কিরণে যেমন অমৃতের আলয় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বিধাতার বিধানে পুরুষ হৃদয়া-কাশ-প্রান্তে উদিত প্রেম-সূর্য্য রমণীর কোমল হৃদয়ে পৌর্ণমাসী যামিনীর রজত জ্যোৎস্না বিনিন্দিত কোমল অথচ ভাবোত্তেজক,

স্নিগ্ধ অথচ পিপাসা বর্দ্ধনকারী, লোকদৃষ্টির অতীত এক অতি সুন্দর প্রেম-জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়া থাকে—মানুষ সতত সে অমৃত ভোগ করিতে পায় না, অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। এই জন্য মানুষ নিজের বিকৃতচিত্ত-প্রসূত উল্কাপিণ্ডপাত হেতু আলোককে নক্ষত্রালোক ও নিজ পাপাগ্নি-প্রসূত ভয়ঙ্কর দাবদাহকে চন্দ্রমার সুধাময় স্নিগ্ধ কিরণ ভ্রমে সমাদর করিয়া, মানুষের নিকৃষ্টবৃত্তিনিচয়কে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। ঐ দেখ বিনয়ভূষণের প্রেমসূর্য্যের জ্যোতি প্রভাবে আজ প্রেমমালার প্রেমচন্দ্রের পূর্ণোদয় হইয়াছে—পরস্পরের আকর্ষণে তরঙ্গ উঠিয়াছে—প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট পরস্পরের হৃদয়ে আজ ভাবের জোয়ার আসিয়াছে—হৃদয়-নদী আজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে—ঐ যে অশ্রুনীরে বিনয়ের উপাধান ভাসিয়া গেল—ঐ যে চক্ষের জলে প্রেমমালা সমস্ত পরিধেয় সিক্ত করিলেন, কেন, কে বলিবে কেন? কথা নাই—বার্ত্তা নাই, তবে এ রোদন কিসের? ভগ্নহৃদয় যখন নিরাশার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়, তখন যদি এমন কোন আশ্রয় পাওয়া যায়, যাহাকে ধরিলে উত্তপ্ত মস্তক শীতল হয়—শুষ্ক হৃদয় সরস হয়—চঞ্চল চিত্ত স্থির হয়; তবে সেই অবলম্বনের বস্তুকে ধরিয়া প্রাণের মধ্যে যে এক অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়, এ সেই ভাষাবর্জ্জিত মনমুগ্ধকর ভাব, ইহারই আঘাতে মানুষ ভাঙ্গিয়াছে, ইহারই অনুমাত্র পাইয়া মানুষ দেবতা হইয়াছে—ইহলোকে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়াছে—মানুষ মানুষের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে—ইহাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে—অনন্তকাল বাঁচাইয়া রাখে—যে

যত পায়, তাহার ততই জীবন লাভ হয়—প্রেমই জীবন—অনন্ত প্রেম, অনন্ত জীবন দান করে।

মনোরমা বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া, একদৃষ্টিতে তাঁহাদের দুই জনের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। মনোরমা ভাবিতেছেন—এ কি, এরা কথা কয় না, অথচ দুই জনেই কাঁদিয়া আকুল! মনোরমা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাল-বৈধব্যের কৃপায় আজিও তিনি বালিকা, ভালবাসা কাহাকে বলে—অনুরাগ কাহাকে বলে—তাহা তিনি জানেন না, ভাল বাসার তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া কাহারও জন্য কাঁদিতে হয় নাই। কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা গৃহিণী মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা মনো, বোউমা আসিয়াছেন, আজ আমি রাঁধিতে গেলাম; তুমি পাড়ার কোন বাড়ী হইতে একটু নুন ধার ক'রে আন। মনোরমা মাতৃআজ্ঞা পালনে অগ্রসর হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ দেখা।

প্রেমমালা বিনয়ের আরও একটু নিকটে গিয়া বসিলেন এবং আস্তে আস্তে হস্ত প্রসারণ করিয়া বিনয়ের অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি উঠাইয়া বলিলেন, "অত কাতর হলে কেন? অসুখ কি সারিবে না? লোকের সকল দিন কি সমান যায়? এখন দিন গুলি অত্যন্ত কষ্টে যাইতেছে—আবার ভগবানের কৃপায় এমন দিন আসিবে, যখন এই বিষণ্ণ মন প্রসন্ন হইবে, পীড়িত ও দুর্ব্বল শরীর সুস্থ ও সবল হইবে। প্রেমমালার মিষ্ট কথায় তাঁহার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।" প্রেমমালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি জ্বর হয়?" বিনয়ভূষণ রুদ্ধ ও ভগ্নস্বরে বলিলেন, "এত দিন একটু ভাল ছিলাম, কয়েকদিন থেকে আবার একটু একটু জ্বর হইতেছে। প্রেমমালা, প্রিয়-তমে, দেখ তোমার নিখুঁত ভালবাসা স্মরণ করিয়াই এতদিন জীবিত আছি—তোমাকে সুখী করিব, তোমার জ্ঞানও ধর্ম্মো-ন্নতির পথে সহায়তা করিয়া পরম সুখানুভব করিব—এই আশাই আমাকে এত দিন নানা দুঃখ বিপদের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে আমি বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—আমার কোন আশাই পূর্ণ হইল না—এ ভগ্নহৃদয় আর গড়িবে না—এ উৎসাহবিহীন জীবনে আর উত্থান সম্ভবে না—আমার সকল আশাই অস্তমিত

হইয়াছে।” এই বলিয়া বিনয়ভূষণ চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। প্রেমমালা সযত্নে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন, “চুপ কর, পীড়িত শরীর, অত চঞ্চল হইলে, অসুখ আরও বাড়িবে।”

গৃহে অগ্নি লাগিলে তথায় বায়ুর প্রবল পরাক্রম যেমন স্বাভাবিক, মানুষের বিপদের দিনে দারিদ্র সমাগমও সেইরূপ স্বাভাবিক। এক দিন, দুই দিন করিয়া প্রায় একমাস হইতে চলিল, প্রেমমালা আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়াছেন। চিকিৎসা ও ঔষধাদির সুব্যবস্থা করিতে কোন ত্রুটি হইতেছেনা, কিন্তু পীড়া প্রশমিত না হইয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। আর দুই চারি দিন যাইতে না যাইতে পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি হইল। ডাক্তার, কবিরাজ, দৈবউপায় সমস্তই বিফল হইল। গৃহিণীর হাতে যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহা বহুকাল হইল খরচ হইয়া গিয়াছে—মনোরমার দুই একখানি অলঙ্কার ছিল, তাহাও বন্ধক দিয়া ঋণ করিয়া ঔষধাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রেমমালা পিতৃভবন হইতে যাহা কিছু অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহাও খরচ হইয়া গেল, অর্থাভাবে ক্লেশের এক শেষ হইল। প্রেমমালা স্বামীর চিকিৎসার জন্য নিজ অলঙ্কারগুলি শাশুড়ীর হাতে দিয়া বলিলেন, “এই গুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকা হয়, তাহা দ্বারা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন।” এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পিতাকে, কিছু টাকা লইয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। মনোহরগঞ্জ হইতে প্রতিদিন ডাক্তার আসিতেছেন এবং চিকিৎসাও চলিতেছে, প্রেমমালা,

মনোরমা, এবং পাড়ার দুই একটি বন্ধু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত রোগীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। গোপাল বাবু সংবাদ পাইয়া বিনয়কে দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎ কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছেন। বিনয়ের পীড়ার কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে যথা সময়ে আসিতে পারিলেন না। সকলে খাটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছে।

পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,এমন ঘোর বিপদের দিনে হৃদয়ভূষণ কোথায়? তিনি কি এমন নীচপ্রকৃতির লোক যে, এ দুর্দ্দিনে একবার দেখিলেন না? কেহ নিরাশ হইবেন না—আজ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যখন শুনিলেন যে, বিনয়ভূষণের মুখের নীচের অর্দ্ধাংশ একবারে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছে যে, ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে চায় না। যখন তাঁহার জীবিত থাকা অপেক্ষা তাঁহার আশুমৃত্যু নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে, যখন বিনয়ের কল্পনা-কাননে রোপিত আশা বৃক্ষের পরস্পরের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে—আর অল্পকাল মধ্যে যে অগ্নিতে সেই সুবিস্তৃত কল্পনা কানন ভস্মীভূত হইবে—যখন ক্ষুদ্র হস্তের জলসেচনে আর সে দাবদাহ নিবাইতে পারিবে না, তখন সেই অনন্ত বিপদসাগরে ভাসমান ভগ্নতরীর জলমগ্ন দর্শন করিতে ও কূলে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে আসিয়াছেন। আজ বৈশাখের বিংশতিতম দিবসে

তৈলপূর্ণ জীবন-প্রদীপ সংসার বাত্যাঘাতে নির্ব্বাপিত হইল। কে জানিত যে এই সুন্দর, সুকোমল ও পরিমলপূর্ণ জীবন-পুষ্প অত্যাচারের প্রখর তাপে নীরস ও শুষ্ক হইবে—কে জানিত যে ভবনদীর প্রবল স্রোতের ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে পড়িয়া বিনয়ের জীবন-তরী অসময়ে ডুবিবে? আজ দিবাবসানে দিনমণির ম্লানমুখে অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ভূষণও ভবনাট্যশালার ক্রীড়া শেষ করিয়া—স্নেহময়ী জননীর বক্ষে পুত্রশোকরূপ প্রচণ্ড বজ্র নিক্ষেপ করিয়া—প্রেমপ্রতিমা প্রিয়তমার আশা-গৃহে অগ্নি লাগাইয়া—স্নেহের আধার সহোদরার শোকসন্তপ্ত প্রাণকে নিরাশার ঘন মেঘে আবৃত করিয়া—ক্ষুদ্র গৃহে হাহা-কার ধ্বনি উঠাইয়া, কাল রজনীর গভীর অন্ধকারে লুকাইলেন। সংসার-যাতনা মুক্ত হইয়া—অশান্তির অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া, প্রেমের রাজ্যে—শান্তির রাজ্যে—অনন্ত উন্নতির রাজ্যে অগ্রসর হইলেন। যে মর্ম্মবেদনা জননীর হৃদয় দগ্ধ করি-তেছে—যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রেমমালার প্রাণকে মরুভূমে পরি-ণত করিতেছে—যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনোরমার সরল প্রাণকে বিদ্ধ করিতেছে, ইহার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত হয় না—ই অনুভব করিতে পারা যায়। ইহা অগ্নি অপেক্ষা উত্তপ্ত—তরবারি অপেক্ষা শতগুণে ধারাল—দস্যু অপেক্ষা শতগুণে ভয়াবহ—সর্পদংশন অপেক্ষা শতগুণে যন্ত্রণাদায়ক। দেখিয়া বা শুনিয়া কেহ কখন ইহার পরিমাণ করিতে পারে না—যিনি পুত্রশোক পাইয়াছেন, যিনি যৌবনে গুণবান্ ও অনুরাগী স্বামীর মৃত্যুতে বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—যিনি এমন ভাইএর অভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন—

তাঁহাদিগকে একত্র করিলে যে চিত্র প্রতিফলিত হয়, আজ বিনয়ভূষণের গৃহ ঠিক তাহাই হইয়াছে,যে শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে তাহা চিন্তা মাত্রেও শরীর কণ্টকিত হয়, আজ এই বিধবাদের কথা ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বিনয়ের উন্নতি, মনে মনে আশা ভরসা পোষণ ও শেষ পরিণাম. এ সকল আদ্যোপান্ত চিন্তা করিলে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। হৃদয়ভূষণ, গোপাল বাবু প্রভৃতি কয়েক জন একত্র হইয়া বিনয়ের মৃতদেহ বহন করিয়া নদী তটে লইয়া গেলেন এবং যথাবিধি বিনয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই কি অনুতাপ?

চিতাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, হৃদয়ভূষণ নদীতীরে এক 'য়া একান্ত মনে কি ভাবিতেছেন। আজ তাঁহার বন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষাদিত চিত্তে হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া, আপনার কৃত কর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিতেছেন। মানুষের স্বভাবই এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে নিজকৃত অপরাধকে গুরুতর বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন মতেই প্রস্তুত নহে—ঘোর অপরাধে অপরাধী হইলেও নিজ অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করিতে প্রয়াস পাওয়া যেন স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগটি প্রবল হওয়াতে মনুষ্য সমাজের যে

প্রভূত অপকার হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠাই কঠিন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—জ্ঞানবান্—ধার্ম্মিকপ্রবর হইতে পর্ণ-কুটীরবাসী অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণ মনের লোক পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর দেখিবে, অত্যন্ত ঘৃণিত দোষে দোষী দেখিয়াও নিজের মমতাময় জীবনের উপর সদয় ব্যবহার করিতে ও ক্ষমার ভাব দেখাইতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত—আপনার অপরাধের পরিমাণকে লঘু করিতে পারিলে, পরম তৃপ্তি লাভ করে। যে দোষ অন্য জনে হইলে পর্ব্বত প্রমাণ হইত, তাহাই নিজেতে তৃণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র। মানুষ যদি আপনার অপরাধকে ক্ষমা করিতে এত ব্যস্ত না হইত, তাহা হইলে আজ সংসারের এ দশা হইত না। আত্ম-দোষ অনুসন্ধান করিয়া, তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে ও তাহা সংশোধন করিতে, লোক ব্যস্ত হইলে, এ সংসার পরম রমণীয় শান্তি নিকেতনে—অমৃত ধামে, পরিণত হইত—বিধাতার বিধি সহজে সুসিদ্ধ হইত। হৃদয়ভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃত পাপের পরিমাণ কমাইতে পারিলেন না—যতই সে বিষাদ-ময় চিত্র ভুলিতে চেষ্টা করেন—আকাশের শোভা—নক্ষত্রের উঁকি মারা—নদীর কল্লোল—উপবনের নিবিড় নিকুঞ্জে যতই আপনাকে লুকাইতে যান—সম্মুখস্থ চিতাগ্নি—বিনয়ভূষণের দেহের পরিণাম, ততই তাঁহাকে তাঁহার কৃত কর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও কৃত পাপের ভার কমাইতে পারিলেন না। পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা—বালিকা স্ত্রীর কুপরামর্শ—নিজের অসদভিপ্রায়—নানা প্রকার অসদুপায়ে বিনয়কে বঞ্চনা করা—বিমাতার চক্ষের জল—ভগ্নীকে প্রহার—তাহাদের অন্নকষ্ট, একে একে স্মরণ হইয়া তাঁহাকে অস্থির

করিয়া তুলিল; ক্রমে নিজের দোষ দেখিতে লাগিলেন—প্রাণের যাতনাও অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল—প্রজ্জলিত অগ্নিতে দগ্ধীভূত দেহের যন্ত্রণা—কালকূটভরা সর্পের তীক্ষ্ণ দংশনের যন্ত্রণা অপেক্ষা শত গুণে অধিক যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিজের দোষ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া পড়িল—তিনি উন্মত্তের ন্যায় চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে আপনার এক একটি দোষ ধরিতে লাগিলেন—শেষে আর গণনা হয় না। তিনি দেখিলেন, যাহার দেহ তাঁহারই সম্মুখে ভস্মীভূত হইতেছে, তাহার অকাল মৃত্যু তিনিই ঘটাইয়াছেন—তিনিই তিনটি বিধবাকে সংসারে অবলম্বন-বিহীন করিয়া আঁধারে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তিনি একটু সদয় ব্যবহার করিলে, আজ বিনয়-ভূষণ জননী ভগ্নী ও সহধর্ম্মিণীকে শোকসাগরে ডুবাইয়া অতীতের আঁধারে লুকাইতেন না। এ সকল চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ভূষণ অধীর হইয়া উঠিলেন—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন—ক্রমে মনের ক্ষোভ আরও প্রবল হইল—হৃদয় উথলিয়া উঠিল—বুঝিতে পারিলেন যে, এক অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি কুস্বভাবা স্ত্রীর প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার অর্থ লালসাই আজ নিরপরাধিনী পরের মেয়েকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করাইল, তখন তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইল, উন্মত্তের ন্যায় বিনয়ের প্রজ্জলিত চিতানলে প্রবেশ করিতে গেলেন। গোপাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যান?"—উত্তর নাই। যাতনাময় জীবনের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। গোপাল

বাবু বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ভূষণের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। গোপাল বাবু যাইতে না যাইতে, হৃদয়ভূষণ বিনয়ের চিতানলে প্রবেশ করিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশন শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া হৃদয়ভূষণকে গ্রাস করিল। গোপাল বাবু "সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল।" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া গিয়া হৃদয়ভূষণকে টানিয়া বাহির করিলেন। বাহির করিয়া দেখেন শরীরের অধিকাংশ স্থান দগ্ধ হইয়াছে। দগ্ধ হইয়াছে সত্য,—যাতনা ও হইতেছে সত্য—কথা কহিবার শক্তি এখনও আছে সত্য, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্। চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া হৃদয়ভূষণের অর্দ্ধমৃত দেহ লইয়া সকলে সত্বরপদে গৃহে আসিলেন। গৃহের সকলে দেখিয়া অবাক্। হৃদয়ভূষণ জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, একবার আমার মাথায় একটু পায়ের ধুলা দাও, আমার যন্ত্রণা কমিবে।" ভগ্নাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর—আমার বড় যাতনা হইতেছে।" বিনয়ের স্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা, আমি পামর, তাই তোমার মত লক্ষ্মীকে দুঃখিনী করিলাম—আমার মুখে পদাঘাত কর, আমার পাপের অবসান হউক—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আর কতক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করিব ? দীনবন্ধু হরি, আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।"

হৃদয়ভূষণ তাঁহার কুটিলা স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র, এক কন্যা ও পূর্ব্বপক্ষের এক কন্যা রাখিয়া তিন দিনের দিন প্রাতে কুটিল সংসারের মোহ-জাল ছিন্ন করিলেন—পরলোকের পথে অগ্রসর হইলেন। সংসারে নিরন্তরই এইরূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে। হায়, কাল যে সংসারের কুমন্ত্রণা পরিচালিত হইয়া

নানা প্রকার পাপ কার্য্যে নিযুক্ত, আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভাবী কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিতেছে। আজ বাড়ীর সকলগুলি, শত্রুতা ভুলিয়া, একত্র হইয়া রোদন করিতেছে—আজ বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত রোদন-ধ্বনিতে গৃহ বিকম্পিত, পাড়ার লোক পর্য্যন্ত মনের ক্ষোভে মুহ্যমান। আজ শোক-সিন্ধু উথলিয়া ভয়ঙ্কর নিনাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে—আজ চারিদিক হাহাকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদটি কে?

পাঠক আর কেন? যাহাকে লইয়া আমরা এতক্ষণ সময়াতিপাত করিতেছিলাম—যাহার আশাতে উৎফুল্ল ও নিরাশাতে ম্রিয়মাণ হইয়া,—যাহার সুখে আনন্দ ও দুঃখে শোক প্রকাশ করিয়া এত দূর আসিয়াছিলাম, আজ সেই বিনয়ভূষণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। আর আমরা এখানে এ ভাঙ্গা হাটে এই কয়েকটি বিধবার পরিণাম দর্শন করিতে কেন বিলম্ব করিব? আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে, তাহাতে আবার বিধবা হইলে তাহাদের জীবনের যে সামান্য গৌরবটুকু, তাহাও ফুরাইয়া যায়। এরূপ শোভা ও সৌন্দর্য্যবিহীন জীবনের শেষ অভিনয় দেখিবার জন্য আর বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই

—এদৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে নেত্রপাত করুন। ঐ দেখুন, সংসার-নাট্যশালাতে যুবক যুবতীর—নায়ক নায়িকার চরিত্রের অতি নিগূঢ় ভাব সকল মনোনিবেশ সহকারে অনুধ্যান করিয়া পরম সুখ অনুভব করিতে লোক নিরন্তর প্রয়াস পাইতেছে—এমন অবস্থায় এখানে থাকা—বৈধব্যের শেষ দৃশ্য দেখিবার জন্য বিলম্ব করা, আর বাহারও ভাল দেখায় না। তবে যদি নিতান্তই অপেক্ষা করিতে, দুঃখিনী বিধবাদের পরিণাম দেখিয়া, একটু সদ্ভাব দেখাইতে—সহানুভূতির একটি নিশ্বাস ফেলিতে প্রাণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে একটু স্থির ভাবে, শান্ত মনে, নারীজীবনের প্রেম, সদ্ভাব, ত্যাগ-স্বীকার ও চরিত্রের গভীরতা পরীক্ষা করুন।

শরৎ এতদিন এলাহাবাদে ছিলেন। সংসারের ঘটনাচক্র তাঁহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়াছিল। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে বিনয়ভূষণের পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন—পীড়ার সংবাদ পাওয়া অবধি একবার তাঁহাকে দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কোন একটি ঘটনাসূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি অচিরকাল মধ্যে কলিকাতায় আসিলেন এবং সেই অবসরে বিনয়ভূষণকে একবার দেখিয়া আসার মানস করিলেন। যুবকের মন, যেমন ইচ্ছা হওয়া, অমনি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল—বিনয়ভূষণের মৃত্যুর পর এক মাসের অধিক হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে,তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিনয়ভূষণের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা অনতিকাল মধ্যে নিদারুণ সংবাদের কঠোর

তাড়নায় শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতে না করিতে বামাকণ্ঠে রোদন ধ্বনি উঠিল—তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইল—প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া জননীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল—তিনি পুত্রগুণ গান করিয়া—তাহার গুণের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া সরবে রোদন করিতে লাগিলেন, চক্ষের জলে বৃদ্ধা ভাসিতে লাগিলেন। মনোরমা মায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন, কেবল প্রেমমালা এক পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসাইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন—সে শূন্য হৃদয়ের গভীর অভাব ও মর্ম্মবেদনা কে বুঝিবে—কাহার সাধ্য সে শোক বহ্নির শক্তি পরীক্ষা করে? মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া শরৎচন্দ্রকে বসিবার জন্য একখানি আসন দিলেন। শরৎ এতক্ষণ আত্মহারা হইয়া নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন—আমার প্রাণের সদ্ভাবের আদান প্রদান কাহার সহিত হইবে?—আমার হৃদয়ের একটা দিক্ যে অন্ধকার হইয়া গেল—এমন প্রাণের বন্ধু ত আর হবে না!—এমন সরল প্রকৃতি—এমন নির্ম্মল মন—এমন বিনয়—এমন শান্ত স্বভাব ত আর দেখি নাই। চরিত্রের বল—পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা—অন্যায়ের উপর ঘৃণা—বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি এমনত দেখি নাই। নিজের দোষ দেখিলে স্বীকার করিতে—আত্মদোষ সংশোধন করিতে—অপরের গুন স্মরণ করিয়া দোষ ক্ষমা করিতে,এমন ত দেখিনাই। এত আশা ভরসা—এত আকাঙ্ক্ষা কিছুই পূর্ণ হইল না। এত অল্প বয়সে, বিনয়ের জীবনলীলা শেষ হইল! বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল? বিনয়ভূষণ আর নাই, একথা শরৎ সহজে বিশ্বাস করিতে

পারিতেছেন না—তাঁহার প্রাণের বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া পলায়ন করিয়াছেন—তাঁহার প্রাণ এ কথা গ্রহণ করিতে চায় না—তাঁহার ধারণা হয় না! তিনি নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে প্রাঙ্গণ বিধৌত করিতে লাগিলেন। কয়টি বিধবার পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল—তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, তিনি সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন।

বিনয়ভূষণের শ্বশুর আজ কয়েক দিন হইল. কন্যাকে লইবার জন্য আসিয়াছিলেন, প্রেমমালা মাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেও পুত্রশোকদগ্ধা শাশুড়ীকে ফেলিয়া এত শীঘ্র যাইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহার পিতাকে এবার একাকী ফিরিয়া যাইতে হইবে, তিনি এখনও চলিয়া যান নাই, আজ কাল করিয়া বিলম্ব হইয়াছে। আগামী কল্য তিনি গৃহে গমন করিবেন—পরে আবার আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবেন। আজ তিনি গ্রামের কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন—আসিয়া দেখেন যে একটি ভদ্রলোক মাথা হেঁট করিয়া উঠানে বসিয়া আছেন। লোকটি কে জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইল—নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বিনয়ের পরম বন্ধু শরৎচন্দ্র বসিয়া চক্ষের জলে সে স্থানটি সমস্ত ভিজাইয়া ফেলিয়াছেন। তখন নিজে বিষণ্ণ মুখে তাঁহার নিকটে গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন; "এখানে বসিয়া কেন? উঠিয়া উপরে এস, এমন করিয়া এখানে কি বসে?" তখন শরৎ অশ্রু সম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিনয়ের শ্বশুরকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন "আর কোথায় বসিব—এবাড়ীতে বসা শেষ হইয়া গিয়াছে— আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; আমি এখনই এখান হইতে যাই—এক তিল দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইতেছে না—আমার ভয়ানক ক্লেশ হইতেছে।" বিনয়ের শ্বশুর শরতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, মানুষে যা চায়, তাই যদি পায়, তা হ'লে আর ভাবনা কি ? আমার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে সংসারের বহুল অনিষ্ট ঘটিবে, তাই জগতে নিরন্তর ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, তাঁহার রাজ্যে মন্দ কিছুই নাই—আমরা যেখানে অমঙ্গল গণনা করি, বিধাতার ইচ্ছা সেখানে মঙ্গল ফল বিধান করিতেছেন—শান্ত হও, বসিয়া বিশ্রাম কর।"

শরৎ এই প্রবীণ লোকের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন—যাঁহার পুত্র সন্তান নাই, সুপাত্রে, রূপে গুণে অনুপমা কন্যার বিবাহ দিয়া, এত অল্প দিনের ভিতর জামাতার বিয়োগ ও কন্যার বালবৈধব্য তাঁহার বক্ষে শেলসম পড়িয়াছে, তাহাও সম্বরণ করিয়া একজন যুবককে শান্ত হইতে উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া, শরৎচন্দ্র অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ইহাঁতে সদাচারী, কর্ম্মশীল, সংযতচিত্ত ধার্ম্মিক হিন্দু চরিত্রের আভাস পাইয়া এই শোকোচ্ছ্বাসের ভিতর আনন্দ অনুভব করিলেন—তাঁহার নিকট আজ একটি কল্পনা সত্যেতে পরিণত হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সংসারের সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও এক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ভাবে বাস করিতে পারে—যে শক্তি লাভ করিলে মানুষ হৃদয়কে সংসারের সেবাতে নিযুক্ত রাখিয়াও চিত্তকে জীবনের উচ্চতর কার্য্যে—ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত করিতে

পারে, সে শক্তি কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, বুঝিলেন যে, মানুষ অনাসক্ত ভাবে বাস করিয়া সংসারের সকল কর্ত্তব্য অতি. সুন্দর ভাবে পালন করিতে পারে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আজ তাঁহার প্রাণের দৃষ্টি একটু উজ্জ্বল হইল, তিনি বাস্তবিকই উপকৃত হইলেন—তিনি বুঝিলেন যে ভগবান্ অমঙ্গলের ভিতর দিয়াও মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন—পাপের ভিতর দিয়াও পুণ্যের পথে লইয়া যান—দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়াও কত অমূল্য রত্ন আনিয়া দেন!

শরৎ শান্ত হইলেন—উঠিয়া বসিলেন, গভীর মনোবেদনার সহিত বলিলেন, "একবার দেখা হইল না, আমার মনের এ দুঃখ কখন ঘুচিবে না—আমি পীড়ার সময়ে নিকটে থাকিয়া সেবা করিতে ও চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না এ দুঃখ ম'লেও যাবে না।" এই বলিয়া নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার কাতরোক্তি সকল তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় প্রাণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধার নিকট গিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখুন আপনাকে শান্ত করিবার কিছুই নাই, এমন কোন কথা নাই যাহা বলিলে, আপনার প্রাণ প্রবোধ মানিবে, আপনি সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন—আপনার অনেক সহ্য করা আছে—আপনার ক্লেশ ও কাতরতা দেখিয়া বড় কষ্ট হচ্চে, আপনি শান্ত হউন, আজ আমি আপনার সন্তানের সমস্ত কাজ করিব—আমাকে দিয়া আপনার সকল অভাব পূর্ণ করুন—আমার দ্বারা আপনার যতটুকু তৃপ্তি হইতে পারে—আমি তাহা করিতে প্রাণপণ যত্ন করিব। আপনি আমার মা,

আপনি শান্ত হউন—আপনার এ অবস্থা আর দেখা যায় না।” এইরূপ অনেক বুঝান'র পর বৃদ্ধা একটু শান্ত হইলেন। অনেক রাত্রি হইয়া যায় দেখিয়া মনোরমা বোউকে সঙ্গে লইয়া রান্নাঘরে গেলেন। ঘরে যাহা কিছু ছিল, তাহাই রন্ধন করিলেন। প্রেমমালা পিতাকে ও শরৎবাবুকে খাওয়াইলেন। আহারান্তে বিনয়ভূষণের শ্বশুর ও তিনি একত্রে এক ঘরে শয়ন করিলেন। বিধবা তিনটি এক ঘরে মনের দুঃখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। বিনয়ভূষণ কবে কি অবস্থায় মারা গিয়াছেন, শরৎ বিনয়ের শ্বশুরের নিকট তাহা সমস্ত শুনিয়া বড়ই বিষাদিত হইলেন। যখন শুনিলেন যে বিনয়ের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার এক পুত্রসন্তান হইয়া ছয় দিন পরে মারা গিয়াছে, তখন প্রেমমালার অবস্থা স্মরণ করিয়া, তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন—শয্যাতে শয়ন করিয়া মনের ক্ষোভে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন—তখন ভাবিতে লাগিলেন, ষোড়শী যুবতী প্রেমমালা কি পাষাণময়ী! না, দেবচরিত্রের উপকরণে গঠিত! কেমন আমাদিগকে খাইতে দিলেন—কেমন যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন—কেমন মিষ্ট কথা, এ কি সংসার, না স্বর্গ? নাই বা হবে কেন? বাপের যে বিশ্বাস, যে চরিত্রের বল দেখিলাম, কন্যাতে তাহার কিছুত থাকা চাই। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা বটে। সংসারে কিরূপ ভাবে বাস করা উচিত, তাহা আমি আজ বেশ বুঝিলাম। কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের ন্যায় নিরন্তর আত্মীয় স্বজনের সেবা করিব, আবার যখনই সময় উপস্থিত হইবে, মৃত্যুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, অক্ষুণ্ণ প্রাণে অনন্ত উন্নতির পথে দাঁড়াইব। এসংসারে এমন কিছু যেন

আমার না থাকে যে, আমাকে পরলোকের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দিবে; বিধাতা দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কে কোথায় গেল।

প্রাতে উঠিয়া প্রেমদার পিতা কুসুমপুর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে কন্যাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া ও বিনয়ের মায়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। শরৎও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া, বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, তুমিও যাবে? যদি এসেছ, তবে এবেলা থাকিয়া যাও, খাওয়াদাওয়ার পর বৈকালে যাইবে।" শরৎচন্দ্র অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে ইচ্ছা নাই। ঘটনাটি কিছু পুরাতন না হইলে, তিনি আর ইহাদের কথা ভাবিতে পারিতেছেন না। দূরে থাকিয়া পত্রাদি দ্বারা সংবাদ লইতে খুব ইচ্ছা, কিন্তু ইহাদের নিকটে থাকিতে যেন দম আটকাইয়া আসিতেছে, সুতরাং তিনি যতক্ষণ থাকিলেন, কেবল যাইবার চিন্তাতেই সে সময়টুকু কাটিল। স্নানান্তে বৃদ্ধার নিকটে বসিয়া অনেক প্রকার কথা বার্ত্তাতে বৃদ্ধার মনের অশান্তি দূর করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন; "বাবা, সেই যে একবার ছেলের ব্যারাম হয়, তুমি আসিয়া ডাক্তার দেখাইয়া আরাম করিয়াছিলে, সেই যে তুমি

আসিলে পর চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল যে, 'শরৎ কোথায়, একবার এস, তোমার হাতে মাকে ও ভগ্নীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হই', সে কথা বাপ আমার আজও মনে আছে—সেবার তোমারই গুণে বিনয়ভূষণ আমার বাঁচিয়াছিল। এখন আপদ বিপদে তোমারই মুখের দিকে তাকাইব—আমারত আর কেউ নেই, যেখানে থাক সংবাদটা নিও, আর তোমার খবরটি লিখিও। আমাদের যেমন কপাল, আমাদের বাতাস যার গায় লাগে, তাহারও ভাল হয় না। দেখ বাপ, যেন ভুলে যেও না। আমার আর কেউ নেই। আমার সোণারচাঁদ ছেলে—আমিই তার সর্ব্বনাশ করি'ছি—এখন তার ফলভোগ করি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

অন্য দিকে রান্নাঘরে রাঁধিতে বাঁধিতে মনোরমা প্রেমমালাকে বলিতেছেন, "দেখ বোউ, বাবুটি দাদার জন্য কা'ল কত কাঁদ্‌লেন—উঁনি আমার দাদাকে বড় ভালবাস্‌তেন। একবার দাদার বড় ব্যাবাম হয়, তুমি তখন বাপের বাড়ীতে, ঐ শরৎ বাবু আসিয়া,মনোহরগঞ্জ হইতে ডাক্তার আনাইয়া দাদাকে আরাম করেন। তুমি ও বাবুকে কি কখন দেখেছ?" প্রেমমালা বলিলেন, "তুমি যে পীড়ার কথা বলিলে, সেই ব্যাবাম সারিলে, তোমার দাদা আর ঐ বাবুটি একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে যান—কয়েকদিন ছিলেন—আমি তখন হইতে উঁহাকে জানি—উঁনি বড় ভাল লোক, বড় শান্ত, কথাগুলি খুব মিষ্ট,তোমার দাদাতে আর ঐ বাবুটিতে 'হরিহর আত্মা', অমন বন্ধুতা সচরাচর হয় না।" মনোরমা বলিলেন, "আমাদের যেমন কপাল, তেমনি ঘটিল, আমি পুরুষমানুষকে কখন

অত কাঁদ্‌তে দেখিনি। কত কথা ব'লে, আমার মাকে শান্ত কর্‌তে লাগ্‌লেন—আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া মায়ের প্রাণ জুড়াইলেন—কত সান্ত্বনা দিলেন। দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল ফুরাইয়াছে— এখন দাদার ভালবাসার জিনিষ ব'লে যাহাকে দেখি, সেই আপনার লোক ব'লে মনে হয়।" এই বলিয়া দুই জনে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে কাজ করিতে লাগিলেন।

প্রেমমালা চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "তোমার দাদার ইচ্ছা ছিল যে, শরৎ বাবুর সহিত আমার ছোট ভগ্নী সুধার বিবাহের চেষ্টা করিবেন, আমারও একান্ত ইচ্ছা ছিল। অমন ভাল লোক আমি দেখি-নাই—আমাদের বাড়ীতে গেলেন—এক দিনেই আমাদের সকলকে আপনার লোক করিয়া ফেলিলেন। মুখ হইতে যে কথাটি বাহির হয়, যেন মধুমাখান—ঠোঁট দুখানিতে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে—মনের সকল ভাব সর্ব্বদাই মুখে প্রকাশ পাইতেছে—দেখিলেই বোধ হয় যেন দুষ্টুমি জানেন না। এক সময় ভাবিয়াছিলাম, তোমার দাদা বিবাহের প্রস্তাব করিলে, আমার বাবা তাহাতে মত দিবেন—সুধাও সুখী হইবে, কিন্তু সে আশা ফুরাইয়াছে—আর কে চেষ্টা করিবে?" মনোরমা বলিলেন, "কেন, তুমি তোমার বাবার কাছে বলিতে পারত? আর তা হ'লে, শরৎ বাবু বেশ আমাদের আপনার লোক হন। বোউ, তুমি ভাল করিয়া চেষ্টা কর—আমার মনে হইতেছে, চেষ্টা করিলে হইবে। দেখ, যাহার গুণের প্রতি লোকের চোখ পড়ে, তাহাকে ভালবাসা মানুষের স্বভাব, না? তাহাকে

ভালবাস্তে পাবলেই যেন মনটা শান্ত হয়, আবাব দেখ, যাহাব উপব ভালবাসা পড়ে, তাহাকে আপনাব লোক কবাব জন্ত লোক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। বোউ, তুমি তোমাব বাবাকে ব'লে শবৎ বাবুব সঙ্গে তোমাব ছোট বোনের বিবাহ দেওয়াও, তা হ'লে বেশ হবে।" প্রেমমালা বলিলেন, "এখন সুধাই বাবার একমাত্র সান্ত্বনাব স্থল। বাবা কে আর পিতামাতাহীন অনাথ যুবকেব সহিত মেয়েব বিবাহ দিবেন? শরৎ বাবুব মা বাপ নাই—কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাতে চলে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আছে বটে, তবুও বোধ হয় বাবা সম্মত হবেন না। শবৎ বাবু বেশ লেখা পড়া শিখিযাছেন, নিজে উপার্জ্জনও কবিতে পাবি-বেন সত্য, আচ্ছা আমি চেষ্টা দেখিব, হ'তেও পাবে, বলা যায় না।" মনোবমা বলিলেন, "বোউ, সকল লোকেরই কি এক দশা হবে? বিপদেব পব বিপদ, পর্ব্বতের মতন হইয়া আমাব দাদাকেত চাপিযা মাবিয়াছে, তা না হ'লে আমাব দাদা এমন অসময়ে মব্‌তেন না।" প্রেমমালা বিষণ্ণ ভাবে একটু কি ভাবিলেন, পবক্ষণেই বলিলেন, "আমাব কপাল পুড়িয়াছে—আমার বরাত মন্দ, আমাব কোন কথা, বলিতে বড়ই লজ্জা হইবে, তবুও একবার বলিব।"

বেলা অধিক হয় দেখিযা বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা কবিলেন, রান্নার আব কত দেবি আছে, মনোরমা বলিলেন সমস্ত হইয়াছে— কেবল বসিলেই হয়। তখন বৃদ্ধা নিজে শরৎকে খাওয়াইতে বসিলেন। শরৎচন্দ্র আহার করিতেছেন এমন সময় বৃদ্ধা বলিলেন, "তুমি আজই যাবে। আমাদের একটু কাজ ক'রে গেলে বড় ভাল হ'তো। আমাদের ত এখানে কেহ নাই—

আমাকে আমার কন্যা ও বৌউটিকে লইয়া সাধুহাটীতে আমার বাপের বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। এখানে আর আমার কে আছে? সেথানে তবুও দেখ্ বাব—চাব্‌টি ভাত—একখান কাপড় দেবার লোক আছে—আমি সেই থানেই থাকিব, তুমি যদি আমাদিগকে সেইখানে পৌছাইয়া দিয়া কলিকাতা যাও, তা হ'লে আমাদেব বড় উপকাব কবা হয়। শবৎচন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। এবং কয়েক দিনেব জন্য নিকটে মনোহবগঞ্জে তাঁহাব আত্মীয় ম্যানেজাব বাবব বাসায গিয়া অপেক্ষা কবিলেন। ম্যানেজাব বাবু বিনয়ভূষণেব মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, অনেকক্ষণ নিব্বত্তবে বসিয়া বহিলেন, পরে কতবার মনেব ক্ষোভ প্রকাশ কবিলেন,—কতবাব বিনয়েব সদ্‌গুণ সমূহেব উল্লেখ করিলেন, কতবাব তাঁহাব মাতা, বিধবা স্ত্রী ও ভগ্নীব ভাবী ক্লেশ স্মবণ কবিযা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, শবৎ আবাব বামপুব গেলেন এবং বিনযেব পরিজনবর্গকে সঙ্গে লইয়া সাধুহাটী যাত্রা করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

একটি অনুরোধ।

সকলে নিরাপদে সাধুহাটীতে পৌঁছিয়াছেন। প্রথম দুই একদিন কান্না কাটিতেই অতীত হইল। অনেক বিলম্ব হয় দেখিয়া শরৎচন্দ্র কলিকাতা যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রেমমালা, মনোরমা ও গৃহিণী সকলেই তাঁহার উপস্থিতি ও কৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। প্রেমমালা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "বোধ হয় আমার সহিত আপনার আর দেখা হবে না, হওয়ার আশাও নাই। অনুগ্রহ করিয়া এই হতভাগিনীকে স্মরণ রাখিবেন এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, যেন আমার মনের কতকগুলি অপূর্ণ আশাকে ফলবতী দেখিয়া শেষে আপনার স্নেহের বন্ধুর পার্শ্বে একটু স্থান লাভ করিতে পারি। সেই অতীত স্মৃতিই আমার সুখ ও শান্তি—আমার ইহলোক ও পরলোকে সান্ত্বনা—আমি চিরদিন আদরের সহিত—ভক্তির সহিত, সেই স্মৃতি প্রাণে পুষিয়া রাখিব—সেই স্মৃতিই আজ আমার এই শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করিতেছে—আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ—সকল কষ্ট ভুলিয়া যাই, আমার কোন পার্থিব সুখ লালসা নাই—তবে আপনার নিকট আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি কখনও পারেন, পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন।" শরৎ বলিলেন, "আপনার অনুরোধটি

জানিতে পারিলে—আর আমার শক্তিতে কুলাইলে আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া পরম সুখ অনুভব করিব।” তখন প্রেমমালা সেই সোহাগের ফুল—প্রেমপ্রতিমা মনোরমার অনিন্দনীয় সুন্দর মুখখানিকে আপন বক্ষে লইয়া বলিলেন, “এই স্বর্ণ-কলিকা কি স্বার্থান্ধ সমাজের নিষ্ঠুর আচবণে প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইবে বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল? এ মুখেব দিকে তাকাইবার লোক কি নাই? আপনি বলিতে পারেন বালবৈধব্য কোন পাপেব প্রায়শ্চিত্ত—কি অপরাধের গুরুদণ্ড? শরৎচন্দ্র নত মস্তকে প্রেমমালাব অনুরোধটি শুনিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যতটুকু শক্তি আমার আছে, তাহা ব্যয় করিয়া আমি একার্য্য সুসিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব—আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা এই স্নেহলতার জীবন-পথ কথঞ্চিৎ সুখকর ও সবল কবিয়া দিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনি জানিবেন যে এ কার্য্যটি সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা বা আয়ত্তের অধীন নহে।” প্রেমমালা বলিলেন, “একথা সত্য, কিন্তু আমি যতটুকু জানি তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার শাশুড়ী নিষ্ঠুব প্রকৃতির স্ত্রীলোক নহেন, তাঁহার মন ভাল—তিনি বড় সবল লোক। তাঁহার অন্য কেহ নাই—এই একমাত্র কন্যা, আবাব একে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসেন। তিনি আপনাকেও নিজের লোক—সন্তানের মত মনে করেন। তিনি তাঁহার কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে, এবং আপনাকে সে কার্য্যে সাহায্য করিতে উদ্যোগী দেখিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মতি দিবেন।” মনোরমা এতক্ষণ প্রেমমালার বক্ষে মাথা রাখিয়া নত দৃষ্টিতে আপন পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ

দ্বারা মৃত্তিকা উঠাইতে ছিলেন। শরৎ বলিলেন, "মনোরমা, আমি তবে যাই? তুমি কি আমাকে কিছু বলিবে?" মনোরমা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া যান, আবার আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন, আরও বলিয়া যান কবে আসিবেন। আপনাকে দেখিয়া আমার মা অনেকটা শান্ত ছিলেন—আপনি যাবেন—আমার মা যখন আবার কাঁদ্‌বেন, জানি না, তখন কি বলিয়া তাঁকে শান্ত করিব।" শরৎ বলিলেন, "মনোরমা তুমি ত লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছ—তোমার মা যখন পত্র লিখিতে বলিবেন, তখন আমাকে পত্রাদি লিখিবে, আমিও তোমাদের পত্র পাইলে তাহার উত্তর লিখিব। আমি তোমাকে ও তোমার বিষয় চিন্তা করিতে ভুলিব না, তোমার একটি দাদা অসময়ে সংসার ত্যাগ করিয়া পরলোকে বাস করিতেছেন; তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার আর এক দাদা তোমার মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত হইল।" শরতের অকৃত্রিম ভালবাসাতে মনোরমার কোমল মন মুগ্ধ হইল। শরৎ যাইবার সময়ে গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার মিষ্ট কথায় পরিতৃপ্ত করিয়া ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত হইলেন। সকলেই সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর একটি স্নেহের পুতুল—ভালবাসার জিনিসকে কে যেন চুপে চুপে হৃদয় শূন্য করিয়া অপহরণ করিল। বৃদ্ধা গৃহিণী ক্ষণেক বসিয়া কি ভাবিলেন, পরক্ষণেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মনোরমা ও প্রেমমালা তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে শান্ত করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মনোরমাকে একখানি পত্র লিখিলেন—তাহাতে প্রেমমালার ও বৃদ্ধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মাকে বেশ যত্ন করিতে ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রেমমালার মিষ্ট কথা, শান্ত স্বভাব হৃদয়ের সদ্ভাব ও বুদ্ধিমত্তার প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু মনোরমাকে কোন রূপ প্রশংসার ভাবে কিছু লেখেন নাই—অথচ যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইয়া, কল্যাণকামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রেমমালা পত্রখানি পড়িয়া শরৎ বাবুর লিপি চাতুর্য্য ও পত্র লিখিবার প্রণালী দেখিয়া মনে মনে কত-বার তাঁহার প্রশংসা করিলেন। তিনি মনোরমার বুদ্ধির দৌড় বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি ঠাকুরঝি, শরৎ বাবুর পত্রে কেবল আমারই সদ্ব্যবহারের কথা লেখা আছে কেন? তোমার প্রতি এত ভালবাসা দেখাইয়াও শরৎ বাবু তোমার আচরণের কথা একটিও বলেন নাই কেন?" মনো-রমা বলিলেন, "এমন হইতে পারে যে আমাতে প্রশংসার বিষয় কিছু নাই, অথবা আমার প্রশংসা করিয়া আমাকে পত্র লিখিলে, পাছে আমার মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হয়—এরূপ অহঙ্কার আমার মনে একবার স্থান পাইলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে—এই ভয়ে বোধহয় আমাকে কিছু না লিখিতেও পারেন।" প্রেমমালা বলিলেন, "বাস্তবিকই প্রশংসাতে অনেক অপকার হয়—কত ভাললোক প্রশংসা লোলুপ হইয়া আপনার ও অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে—যাহা হউক, শরৎ বাবু বড় সতর্ক লোক। দুই এক দিনের ভিতরে মনোরমা মায়ের আদেশমত শরৎ চন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। পত্রে প্রেমমালার পিত্রালয়ে যাইবার

কথাও লিখিলেন, আরও লিখিলেন যে, প্রেমমালা পিত্রালয়ে গেলে, তাঁহার একা থাকা বড়ই ক্লেশকর হইবে। যদি ভাল বই পান, তাহা হইলে ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করেন। শরৎচন্দ্র পত্র পাইবামাত্র মনোরমার পড়িবার জন্য কতকগুলি সুপাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন, এবং লিখিলেন যে তাঁহার ৫০৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম হইয়াছে। লেখা পড়া শিক্ষার জন্য মনোরমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহাই পাঠাইতে পারিবেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্র।

অনেক দিন হইল এই নিদারুণ বজ্রাঘাতে প্রেমমালার মা ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শরীরে এক কড়ার বল নাই—মনে একতিল উৎসাহ নাই—শয়নে স্বপনে প্রেমমালার কথা ভাবেন —উঠিতে বসিতে প্রেমমালার পরিণাম চিন্তা করেন—একবারে পাগলের মত হইয়াছেন। এক দিন তাঁহার প্রাণটা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে—কর্ত্তাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আর কত কাল তাকে সেখানে রাখ্‌বে? আমার প্রাণে যে আর সয় না—একবার তাকে আন না,—মেয়েটাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণটা যে পাগল হয়েছে—একবার যাও।" কর্ত্তা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি পত্রাদি লিখিয়া প্রেমমালাকে

আনিবার দিন পর্য্যন্ত এক প্রকার ঠিক্ করিয়াছেন, তবে বাড়ীতে সর্ব্বদা এসকল কথা তুলিয়া সকলকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন নাই। এক্ষণে দুই এক দিনের মধ্যে প্রেমমালাকে আনিতে যাওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়া, প্রেমমালার মাকে শান্ত করিলেন।

প্রেমমালাকে লইবার জন্য তাঁহার পিতা আজ সাধুহাটীতে আসিয়াছেন—আজ আবার পূর্ব্ব স্মৃতি নূতন ভাবে সকলের মনকে অধিকার করিয়াছে—আজ সকলেই চক্ষের জলে সিক্ত কলেবর। কে কাহাকে শান্ত করিবে? আজ শান্ত করিবার লোক নাই। দীর্ঘ নিশ্বাস ও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে দিন কাটিল। আবার প্রভাত হইল। দুঃখের দিন যদিও বৃহদাকার ধারণ করে সত্য—দুর্ভাবনার রাত্রি দিনের দ্বিগুণ হইলেও তাহা থাকিবার নহে—কখনও থাকে না। প্রাতঃকাল আসিল, প্রেমমালার পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত হইল। মনোরমাকে কতকগুলি সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়া, শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, অনেক মিষ্ট কথায় শ্বাশুড়ীর চক্ষের জল মুছাইয়া, সর্ব্বদা সংবাদ দিবার ও সংবাদ লইবার আশা দিয়া, তিনি নিজে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহে পুরুষ কেহ থাকেন না; সকলেই বিদেশে থাকেন, কেবল মনোরমার মৃত মাতামহের এক বৃদ্ধ কনিষ্ঠ সহোদর গৃহে থাকেন। প্রেমমালা গৃহের প্রত্যেকের নিকট অতি বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া পিতার সঙ্গে নৌকারোহণ করিলেন। মনোরমা নদী-তীরে দাঁড়াইয়া নৌকাখানি দেখিতে লাগিলেন, যেন কোন লোক তাঁহার হৃদয় মনকে অন্ধকারে ডুবাইয়া, নৌকায়

পলায়ন করিতেছে, তাই তিনি সতৃষ্ণ-নয়নে তাহাই দেখিতেছেন। ক্রমে নৌকাখানি অদৃশ্য হইল, মনোরমাও একাকিনী শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রেম-মালা যথাসময়ে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া সকলের মনে শোকাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দুঃখে সকলেই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে এই সকল গোলযোগের মধ্যে আপনার গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যখন সকলের মন শান্ত ভাব ধারণ করিল, তখন তিনি আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি এক্ষণে সকলের, বিশেষতঃ মায়ের, অত্যন্ত আদরের ধন হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রেমমালা কথায় কথায় মাকে বলিলেন, "দেখ মা, কিছু দিন হইতে আমার মনে একটি ইচ্ছার উদয় হইয়াছে, সেইটিকে কাজে করিতে পারিলে, আমার অভিলাষ কিয়ং-পরিমাণে পূর্ণ হয়।" মা তাঁহার বাসনা জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। তখন প্রেমমালা বলিলেন, "আমার অভিপ্রায় আর কিছুই নয়, আমাদের বাড়ীতে গ্রাম ও গ্রামা-ন্তরের বালিকাদের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করি, আর নিজে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করি।" তাঁহার মা তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করিবার আশা দিয়া, তৎ-ক্ষণাৎ জনৈক লোক দ্বারা গৃহকর্ত্তাকে ডাকাইলেন এবং স্নেহের ধন—আদরের কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। প্রেমমালার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না, তিনি কন্যার অভি-প্রায়ানুরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি

নিজ ব্যয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিলেন, এব স্বয়ং বিদ্যালয়ের সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিলেন। প্রেমমালার যত্নে বিদ্যালয়টি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। সময়ে অনেকগুলি বালিকা একত্র হইয়া সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতে লাগিল। যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে, মেয়েরা উত্তরকালে সুগৃহিণী হইতে পারে, প্রেমমালার পিতা সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং নিজ কন্যাকে তদনুরূপ পরামর্শও দিয়া থাকেন। কিছু দিন পরে প্রেমমালা দেখিলেন যে কেবল কতকগুলি পুস্তক পড়াইলে ঠিক হইবে না। আরও অনেক কাজ শিখান আবশ্যক। এইটি তাঁহার মনে উদয় হইলে, তিনি প্রথমে সেলাইএর কাজ শিখাইতে ইচ্ছা করিলেন—কিন্তু নিজে সেলাইএর কাজ ভাল জানেন না, সুতরাং ইচ্ছা হইবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। প্রেমমালা পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, একজন মুসলমান প্রজা আছে, সে বৃদ্ধ ও অতি সৎলোক, তাহাকে মাসে মাসে কিছু বেতন দিয়া নিজে কাপড় কাটিতে ও সেলাই শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগকে সেলাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রেমমালা এই সুযোগে সূচিকার্য্যে বেশ নিপুণতা লাভ করিলেন। এই রূপে বালিকাদিগকে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিয়াও তাঁহার পূর্ণ সন্তোষ লাভ হইল না। তখন তিনি প্রতি শনিবারে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও যৎসামান্য শিক্ষা-লব্ধ নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে বালিকাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবার

জন্য তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া অনেক পুস্তক পাঠ করিতে হইল। বিশেষ ভাবে রামায়ণ ও মহাভারত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলেন এবং তদন্তর্গত সাধুচরিত্রের চিত্র সকল কোমলমতি বালিকাদিগের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। বালিকারা অতি অল্প বয়স হইতেই রামায়ণ মহাভারতের সদুপদেশ সকল "রূপকথার" মত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। যে সকল ধর্ম্মবীরের জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিজে পাঠ করিতে ও গল্পচ্ছলে বালিকাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন তাঁহার জীবনের কার্য্য চলিল। তখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার আশানুরূপ ফল তখনও ফলিতেছে না। বালিকারা তাঁহার নিকট যে সকল শিক্ষা পায়, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে না, প্রেমমালা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, যে সকল গৃহে বালিকারা জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত হইতেছে, সেই সকল গৃহের গৃহিণীরা বড় সোজা লোক নহেন এবং তাঁহাদের সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে যে পরিমাণে যত্ন ও চিন্তার প্রয়োজন—যে পরিমাণে সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক—যে ভাবে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মশীল হওয়া আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের নাই, সুতরাং বিদ্যালয়ে বালিকারা যে সকল সুশিক্ষা লাভ করে, তাহা স্থায়ী হওয়ার পক্ষে জননীগণের উদাসিনতা ও কুশিক্ষা অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে, বালিকাদের গৃহে গৃহে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর দেখিলেন যে, পাড়ায় পাড়ায় এক এক জনের বাড়ীতে মেয়েদের

এক একটি আড্ডা আছে, সেথানে ছোট আদালতের ন্যায় অল্প সময় মধ্যে অনেক মাম্‌লা মোকদ্দমা, ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ হইয়া থাকে। বিশ্বসংসারে এমন বিষয় নাই, যাহার আলোচনা সে স্থানে হয় না। কাহার্‌ ভগ্নী কুচরিত্রা—কোন্‌ লোকের স্ত্রীর সহিত বনিবনাও হইতেছে না—কে স্ত্রীকে ধরিয়া প্রহার করে—কোন্‌ শাশুড়ী বৌউকে খেতে দেয় না—কাহাদের বৌউ হাঁড়িতে খায় ইত্যাদি যত প্রকারের অসদালাপ, তাহাই সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হয় এবং তাহাই নাড়াচাড়া করিতে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। ভারত সভা, ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন—বিলাতী পার্লামেণ্টও ইহাঁদের সভার নিকট পরাজয় মানিয়া থাকে। এ সকল সভায় কত কৃষ্ণদাস, কত সুরেন্দ্রনাথ, কত লালমোহন বিদ্যমান—এখানে কত ব্রাইট্‌, কত ফসেট, কত ডিজ্‌রেলী, কত গ্লাড্‌ষ্টোন আছেন তাহার সংখ্যা হয় না। এখানে যে মীমাংসা হয়, তাহার আর মধ্যস্থ মানিতে হয় না—এখানকার বিচারের আর আপিল নাই—পাকা পোক্ত নিষ্পত্তি। বোধ হয় তাহারই অনুকরণে ভারতীয় বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তারা আধুনিক ছোট আদালতের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, বিলাতী ধরণে তাহাকে পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রেমমালা ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায় করিলে এই অশেষ অমঙ্গলের দৈনিক সম্মিলনগুলি বন্ধ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, এক দিন কোন একটি আড্ডায় বেড়াইতে যাইবেন এবং সেখানে কি হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন। কয়েক দিন ছুটি আছে। যে দিন এইরূপ স্থির করিলেন, তাহার পর দিনই আহারান্তে কোন এক বাড়ীতে,

যেখানে মেয়েরা একত্র হন, সেইখানে গেলেন। যে সকল গৃহিণীরা সেখানে একত্র হন, তাঁহারা সকলেই প্রেমমালা অপেক্ষা বয়সে বড় ও প্রবীণা। কিন্তু সদ্‌গুণ ও সাধুতার এমনই শক্তি, যে প্রেমমালা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে না হইতে তাঁহারা একবারে জড়সড়। কেন, প্রেমমালা তাঁহাদের নিকট বালিকা বলিলেই হয়—তাঁহারা প্রেমমালার মায়ের মত, তবু কেন তাঁহাকে দেখিয়া এমন সঙ্কুচিত? সাধুতার নিকট এইরূপই হইয়া থাকে—এখানে বালক ও প্রবীণ বিচার নাই—জ্ঞানী মূর্খও বিচার নাই। এই এক জিনিস যাহা কেবল পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে আদৃত হইয়া থাকে। প্রেমমালা যাইবামাত্র সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; কেহ কোন কথা কন না। প্রেমমালা বলিলেন, "আপনারা যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কন না কেন?" একজন মহিলা বলিলেন, "প্রেমমালা তোমার হাতে ও কি বই?" তিনি বলিলেন, "সীতার বনবাস।" আর একজন বলিলেন, "বইখানি এনেছ ত একটু পড না শুনি।"

প্রেমমালা পড়িতে আরম্ভ করিলেন, মেয়েরা একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে প্রেমমালা বুঝিতে পারলেন যে, যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই খুব ভাল লাগিতেছে, সকলেই বেশ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইতেছে দেখিয়া আরও উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচর্য্য।

সীতার বনবাস খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, পড়া শেষ হইলে, প্রেমমালা দেখিলেন সকলেই নীরবে বসিয়া আছেন, কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। তখন প্রেমমালা বলিলেন, "আপনারা যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।" এক প্রবীণা রমণী বলিলেন, "দেখ, রামের উপর বড় রাগ হইতেছে। বিনাপরাধে সীতাকে বনবাসে দিলেন, রাবণ বধের পর সীতাকে একবার অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া লইলেন, আবার তাঁহাকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বনবাসে দিলেন! যে সময়ে স্ত্রীলোককে সকল প্রকার স্নেহ মমতা ও যত্নে রক্ষা করা উচিত, সেই সময়ে তাঁহাকে দূরে বনবাসে রাখিলেন। ছি! বালিবধ ও সীতার বনবাস এই দুটি রাম নামে মহা কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে।" প্রেমমালা বলিলেন, "দেখুন, আর এক দিক দিয়া যদি এইটিকে দেখেন, তবে মোহিত হইয়া যাইবেন। সীতা নিরপরাধিনী—পতি অনুরাগিণী—সতী—রাজমহিষী হইয়াও জন্মদুঃখিনী, চিরদিনই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া জীবনযাপন করিয়াছেন। রাজকন্যা—রাজবধূ—রাজরাণী হইয়া, যেভাবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এখনকার মেয়েরা সামান্য একটু কষ্ট পাইলে, অমনি চটিয়া লাল হন, স্বামীর মুখ দেখিতে চান না, কিন্তু সীতা চিরদিনই রামের অর্চ্চনা করিয়া-

ছেন—রাম ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না—শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, রামই তাঁহার প্রাণে চিরবিরাজিত ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য সম্ভাবিতপুত্রা জানকীকে নির্ব্বাসন দেওয়া অপেক্ষা নির্ম্মম ব্যবহার আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই নিষ্ঠুরাচরণেও সীতার চিত্তবিকার ঘটে নাই, বাল্মিকীর আশ্রমে রামের গুণগানেই জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়াছেন। কেমন সুন্দর দৃশ্য। মেয়েরা সকলে এক বাক্যে সীতা-চরিতের মহত্ত্ব অনুভব করিলেন ও তাঁহার বহুল প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রেমমালা বলিলেন, "চন্দনকে শীলাতে ঘষিলেই তাহার সৌরভ চারিদিক ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ জানকী সংসার-শীলাতে পেষিত হওয়াতে অনন্ত সৌরভসম্পন্ন হইয়াছেন —এই জন্যই সে জীবন চির-শোভাময় হইয়াছে—যত ক্লেশ পাইয়াছেন, ততই সে জীবনের মহত্ত্ব ও শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রামের হাতে অত ক্লেশ না পাইলে ত আর সীতা-চরিত্রের অত আদর বাড়িত না!

সে দিন আর পর চর্চ্চাতে সময় কাটাইবার সুবিধা হইল না। তাঁহাদের সভা ভঙ্গ হইবার সময়ে, তাঁহারা প্রেমমালাকে বলিলেন, "আজ আমাদের দিনটি বেশ কাটিল, প্রেমমালা কা'ল আবার আস্‌বে?" প্রেমমালা বলিলেন, "আপনারা আসিতে বলিলেই আমি আসি।" সকলেই বলিলেন, "তবে আসিও" পরদিন যথাসময়ে প্রেমমালা আবার একখানি রামবনবাস হাতে করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সেদিনকার মজ্‌লিসে সকলে একত্র হইয়া প্রেমমালার জন্য

অপেক্ষা করিতেছেন এবং পরস্পর প্রেমমালার মিষ্ট কথা, শান্ত স্বভাব ও অন্যের সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষার প্রচুর প্রশংসা করিতেছেন; এমন সময়ে প্রেমমালা তাঁহার মায়ের সঙ্গে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই প্রেম-মালার মাকে দেখিয়া সাদরে বসাইলেন। প্রেমমালা ও তাঁহার মা ব'সলে পর, গৃহিণীরা সকলে একটু আলাপ করিতে লাগি-লেন, এক এক জনের কথায় অভ্যস্ত পাপ—পরানন্দার আভাস প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া, কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া প্রেমমালাকে বলিলেন "প্রেমমালা, তোমার হাতে আজ ওখানি কি বই ?" তিনি বলিলেন, "রাম বনবাস।" তখন তাঁহারা তাঁহাকে রামের বনবাস পড়িতে অনুরোধ করিলেন। তিনি মায়ের নিকটে বসিয়া পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। রামের স্বার্থত্যাগ, পিতৃভক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য দেখিয়া যেমন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন ও বহুবার রামের প্রশংসা করিলেন, তদ্রূপ আবার অন্যদিকে, কোমলাঙ্গী সীতার মনের দৃঢ়তা ও পত্যানু-রাগ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন ও শতমুখে জানকীর গুণগান করিতে লাগিলেন; শেষে দশরথের মৃত্যু ও কৌশল্যার বিলাপে তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া গেল। রামবনবাস পড়া হইলে তাঁহারা সকলেই প্রেমমালাকে ক্লেশস্বীকারের জন্য অনেক সদ্ভাব জানা-ইলেন। প্রেমমালার মা বলিলেন, "সকলে একত্র হইয়া পরের কথায় না থাকিয়া, যদি এইরূপে পাঁচটা ভাল কথায়, ভাল ভাবে সময় কাটান হয়, তা হলে ভালই হয়। এ রকম পড়া শুনাতে অনেক বিষয় বেশ জানা যায়—অনেক উপদেশও পাওয়া

যায়।” কেহ কেহ একটু বিরক্ত হইলেন এবং পরমপ্রিয় পর-নিন্দার আড্ডাটি উঠিয়া যাইবে শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। কেহ কেহ মুখ কুটিয়া বলিলেন, “তাই ত, তোমরাই এখন থেকে আসবে, আমরা উঠি, আর এ পণ্ডিতদের কাছে আসা হবে না।” এরূপ দুই একজন স্ত্রীলোক সেই দিন হইতেই নানাপ্রকার গুজব রটনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ দুদিন একটু তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন—যাঁহাদের সময়ের সদ্ব্যবহার হইয়াছে—কিছু উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন—তাঁহারা প্রেমমালাকে নিত্য আসিয়া ভাল ভাল বই পড়িতে ও সদালাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রেমমালা যে ভাব দ্বারা চালিত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে অতি উচ্চভাব, সেই উচ্চভাব কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ আসিয়াছে দেখিয়া, এক দিকে যেমন তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছেন, অন্য দিকে আবার সে কার্য্য সাধন ও সুসিদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তিনি নিজেকে এরূপ গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। আর একটি কারণ এই যে, এ কার্য্যে জড়িত হইলে, তাঁহার সাধের বালিকা বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবে, সুতরাং তিনি এ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। তবে কি হইবে? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে আজ বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরামর্শ লইবেন। প্রেমমালা পিতার নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বাবা তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে বালিকা বিদ্যালয়

লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কন্যা যে কার্য্য ধরিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে তত ইচ্ছুক নন। তবে তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, কন্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত—মনের ক্লেশের সহিত এ অনুষ্ঠান ত্যাগ করিবেন। তখন তিনি বলিলেন, “যদি নিতান্তই তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে প্রথমতঃ বালিকাদের কিছু কিছু বেতন দিতে বল। এই বেতন হইতে সংগৃহীত অর্থ সঞ্চয় কর। কিছু টাকা হইলে পরে মাসে মাসে কিছু বেতন দিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে পারিবে। ইচ্ছা হইলে, তোমার ছোট মাসীমাকে আনিতে পার। তিনি বেশ লোক—যাহা কিছু লেখা পড়া জানেন, তাহাতে নীচের মেয়েদের বেশ পড়াইতে পারিবেন। তুমি আপাততঃ উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদের পড়াইবে। পরে তিনি যেরূপ বুদ্ধিমতী তাহাতে যত্ন করিলে, অল্পকাল মধ্যে অনেক শিখিতে পারিবেন এবং তোমার বিশেষ সাহায্য হইবে।” ইহাই পরামর্শাসদ্ধ বলিয়া প্রেমমালা পিতার প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বাবা বলিলেন, “কাল তোমার ছোট মাসীকে একখানি পত্র লেখ। পত্রখানি তোমার লেখাই ভাল দেখায়। আমরা লিখিলে কিছু মনে করিতে পারেন।” পিতার আদেশমত পরদিন প্রেমমালা ছোট মাসীকে পত্র লিখিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচর্য্য অপরাংশ।

প্রেমমালার মাসীমা আসিয়াছেন। তিনি যে লেখা পড়া জানেন, তাহাতে পল্লীগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ান চলিতে পারে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ভাল করিয়া চলে না। শিক্ষাদিবার শক্তিই স্বতন্ত্র, যে সকল সদুপায় অবলম্বন করিলে, শিক্ষা দান ও উপদেশ গ্রহণ সহজ হয়, তাহা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে অনেক বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োজন, বিশেষতঃ কোমলমতি বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া আরও কঠিন কার্য্য, এটি সকল সময়ে সকলের স্মরণ থাকে না। এইজন্য শিক্ষা কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে না। কত দিন পরে যে এদিকে—এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে লোকের দৃষ্টি পড়িবে, তাহা বলা যায় না।

প্রেমমালার মাসীমা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহা দ্বারা কোন সুবিধা বোধ হইল না, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী থাকায়, কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপনাকে সে কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতেও পড়াইতে লাগিলেন। প্রেমমালা বিদ্যালয়ে পড়ান এবং মহিলাদের সমিতিতেও উপস্থিত হইয়া অনেক প্রকার পুস্তক পাঠ ও সমালোচনায় বৈকালের কতকটা সময় অতিবাহিত করেন।

সে সকল পুস্তক পাঠ করেন, তাহার মধ্যে কালীসিংহের মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকই যে কেবল পঠিত হয়, তাহা নহে—এ সকল গ্রন্থ পাঠিত হয়ই—কিন্তু প্রেমমালা তাঁহাদের সময়কে আরও ভালরূপে ব্যয় করাইবার আর এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষীক পরিক্ষা দেওয়ার বিষয় তিনি বিনয়ের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন এই সকল প্রবীণা গৃহিণিগণকেও সেই সম্মিলনীর নিম্নতর শ্রেণীসমূহের পরীক্ষার জন্য রীতিমত পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রেমমালার উত্তেজনা ও উৎসাহে পড়িয়া, অনেক ক্লেশস্বীকার করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সম্মিলনীর সম্পাদক সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুইটি বিধবাকে এইরূপ সে গ্রামের মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তি স্থাপন করিলেন এবং ইহাঁদিগকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে টাকা ও পুস্তকাদির প্রযোজন হইলে, সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষেরা দিয়া থাকেন। প্রেমমালা উৎসাহের সহিত জীবনের এই গুরুতর ব্রত পালনে নিযুক্ত আছেন।

এমন অবস্থায় প্রেমমালাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে চিত্তনিয়োগ করিতে কাহারও ভাল লাগিবে কিনা, জানিনা, তবে আমাদের নিকট এই আত্ম-বিসর্জ্জন—এই লোকসেবা—এই জনহিতকর কার্য্য—এই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের প্রধান ও প্রথম সোপান নির্ম্মাণের কার্য্যে যিনি নিযুক্ত আছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া ব্রহ্মচারিণী—প্রেমমালাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। মনে হয় প্রেমমালা আর কি করিতেছেন, তাহাও

শোভা—দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি। প্রেমমালাকে ব্রহ্মচারিণী বলা হইয়াছে, কেন বলিলাম? প্রেমমালা হিন্দুবিধবার সকল অনুষ্ঠেয় অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া থাকেন। বৈশাখের দাবাগ্নিতে যখন চারিদিক দগ্ধ হইতে থাকে, তখন কন্যাগত-প্রাণা জননী, স্নেহের ধন—প্রেমমালাকে একাদশী করিতে দেখিয়া—উপবাস করিতে দেখিয়া—পিপাসায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় ছটফট করিতে দেখিয়া প্রাণের দায়ে—মনের ক্ষোভে তাঁহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি খান না, বলেন "একটা দিন বইত নয়, আমি আজ আর কিছু খাব না। আমার মত মেয়ের পক্ষে মাসে দুইটি উপবাস মন্দ নয়।" মা বলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, তাতে এত পরিশ্রম কর, না খেলে, মারা যাবে যে।" তবুও তিনি শুনিবেন না। বিনয়ভূষণের মৃত্যু দিন হইতে,সেই যে মাথায় তেল মাখা ছাড়িয়াছেন, আর তাঁহার মা কোন মতেই তেল মাখাইতে পারিলেন না, মাথায় চিরুণী পড়ে না। যখন কোথাও যান খুব মোটা একখানি থান ধুতি পরিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে সর্ব্বত্র যান। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে। প্রেমমালা এই ভাবে জীবনের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখে প্রেমমালার গুণগান শুনিতে পাওয়া যায়। কেন এমন হইল, প্রেমমালাতে এমন কি আছে যে, লোক এত আকৃষ্ট হইল? কি একটু লুক্কায়িত মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য তাঁহাতে ছিল, যাহার নিকট সকলেই নত মস্তক হইত। কেহই তাঁহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইত না। তাঁহার সদ্ব্যবহারের

মধ্যে এমন একটু কমনীয়তা ছিল, যাহার সংস্পর্শে আসিতে সকলেই ইচ্ছা করিত, এই জন্যই তিনি অল্প সময় মধ্যে কদা-চারের স্থানে সদাচার—কুকথার স্থানে সৎকথা—অহিতকারী-সম্মিলনের স্থানে, মঙ্গলপ্রদ শুভ সম্মিলন সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন—এই জন্যই তিনি বহুশ্রম করিয়া অল্প কাল মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টিকে আশাতীত উন্ন-তির অবস্থাতে আনিতে পারিয়াছেন। ক্রমে সেই পল্লীগ্রামের ছোট আদালত সমূহের জজ, উকিল ও মোক্তারগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোকাভাব দূর হইল—তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল।

প্রেমমালা আর একটি বিশেষ কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সকল প্রকার কাজের মধ্যে সেই কাজটিই তাঁহার অধিক প্রিয় ও তৃপ্তিপ্রদ। পাড়ায় কাহারও পীড়া হইয়াছে শুনিলে, প্রেমমালা আর গৃহে থাকেন না, তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত হন। চিকিৎসক ঔষধাদি সেবনের যেরূপ উপদেশ দিয়া যান, প্রেমমালা বেশ মনোযোগ সহকারে সে গুলি শুনিয়া রাখেন, তৎপরে যথন যেরূপ করিলে, চিকিৎ-সকের আদেশ ঠিক পালন করা হয়, তাহাই করিতে বলেন। পিপাসার সময়ে রোগীকে নিজ হস্তে জল দেন, গাত্রদাহে বাতাস করেন, এইরূপে যত প্রকারে রোগীর সেবা করা আবশ্যক তাহা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করিল না, তিনি একখানি হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা পুস্তক আনাইয়া পাঠ করিতে ও ঔষধের বাক্স আনাইয়া পুস্তক-

লিখিত ব্যবস্থানুরূপ ঔষধ পীড়ার সময়ে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে চিকিৎসাতে বেশ সুফল ফলিতে লাগিল দেখিয়া, গ্রামের লোক প্রেমমালাকে যত্ন ও আগ্রহের সহিত ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আরও উৎসাহের সহিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি অধিকাংশ স্থলে কেবল বালক ও স্ত্রীলোকদের পীড়ার সময় সেবা ও চিকিৎসা করিতে যান। এজন্য গ্রামের স্ত্রীলোক সকল তাঁহার আরও পরিচিত হইতে লাগিলেন। সকল বাড়ীতেই যান—সকলের সহিত মিশিয়া থাকেন—সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন—সকলেই দিন দিন তাঁহার জীবনের মূল্য বুঝিতে পারিতেছেন। এইরূপে তিনি মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় আপনার জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম গুলি একটি একটি করিয়া সম্পন্ন করিতে করিতে জীবনের পথে—আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান থাকিয়া—সকল শক্তির শক্তি হইয়া—সকল প্রেমের আধার হইয়া—সকল কার্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় প্রেমমালা বিধবা—তাঁহারই ইচ্ছায় প্রেমমালা ব্রহ্মচারিণী—তাঁহারই ইচ্ছায় প্রেমমালা হিন্দু-বৈধব্যের সকল প্রকার ধর্ম্ম ও ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবনকে কর্ম্মময় করিয়াছেন। তিনি এক মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন,জীবনের অবসান ভিন্ন সে ব্রত শেষ হইবে না। প্রেমমালা প্রেমপ্রতিমা হইয়া নিজ পল্লীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বিধাতা এইরূপে অমঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রভূত মঙ্গলফল উৎপন্ন করাইয়া থাকেন। তাঁহারই কৃপায় এই

রমণী-রত্ন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নির্জ্জনে নারীসমাজের বিবিধ প্রকার মঙ্গলসাধন করিতে করিতে জীবনের শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর এই কৃপা করুন, যেন তিনি এই ভাবে উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজ করিতে করিতে ভবলীলা শেষ করেন। এই এক খানি ছবি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরাতন স্মৃতি।

অনেক দিন হইল শরৎচন্দ্র কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেছেন। প্রথম প্রথম মনোরমার কয়েক খানি পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার পর, যে দুই তিন খানি পত্র লিখিলেন, তাহার আর কোন উত্তর পাইলেন না। ক্রমে তিনি তাহাদের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। বাঙ্গালীচরিত্র মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালীর উৎসাহ ও উদ্যম তালপাতার আগুনের মত—সহসা জ্বলিয়া উঠে ও আলো হয়, কিন্তু তখনই আবার নিবিয়া যায়, স্থায়ী নহে, অনন্ত আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হাউই বাজীর শক্তি কতক্ষণ স্থায়ী হয়? আকাশে উঠিতে না উঠিতে নানাবিধ রঙ্গে আকাশপথ আলোকিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অন্ধকারের ক্রোড়ে লুকায়। বাঙ্গালীর উৎসাহ ও উদ্যম তদনুরূপ, এই আছে, এই নাই—এ বেলা আছে, ও বেলা নাই—আজ আছে কাল নাই—তাহারই ফলস্বরূপ এ জাতীর

কোন স্থায়ী উন্নতিও হইতেছে না। যতদিন এ জাতীর এ মহাব্যাধি আরোগ্য না হইবে, ততদিন ইহার কল্যাণ নাই। যাঁহারা এ দেশের কল্যাণ চান, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এই যে এদেশীয় যুবকগণকে ন্যায়ানুষ্ঠানে আশক্ত—সত্যেতে অনুরাগী—পবিত্রতা ও প্রেমে পরিপুষ্ট—লোকের হিতব্রতে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন। এমন না হইলে, এদেশের বহুকালব্যাপী ব্যাধি সকল আরোগ্য হইবে না।

প্রায় দুই বৎসর কাল হইতে চলিল শরৎচন্দ্র, প্রেমমালা মনোরমা ও মনোরমার মাকে সাধুহাটীতে রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহার প্রায় ছয়মাস কাল পত্রাদি দ্বারা সংবাদ লইয়াছিলেন, এখন আর কোন সংবাদই পান না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে অনেকগুলি সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে গোল দীঘীর বাগানে ভ্রমণ করিতেছেন। সহসা মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। চঞ্চলতার কারণ অনুসন্ধান করিলেন, প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চিন্তা-সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক দূরে গিয়া দেখিলেন, যে সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা মনোরমাকে আশা দিয়া আসিয়াছিলেন যে তাহার জন্য কিছু করিবেন—তাহা করেন নাই—করিলেন না—করিবার চেষ্টাও নাই। তাহাই অজ্ঞাতসারে প্রাণকে পোড়াইতেছে—তখন প্রেমমালার অনুরোধ—মনোরমার মনের ভাব—বৃদ্ধা গৃহিনীর ভাবী আশা ভরসা, সমস্তই মনে পড়িল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেনঃ—মনোরমার নিরাশাময় জীবনের দুঃসহ যাতনা কেবল চিত্তপটে চিত্রিত করিলে—তাঁহার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিলে,

সমস্ত কার্য্য শেষ হইল না। সময়গুণে এদেশে বিধবার দুঃখ বর্ণনাতীত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে রক্তমাংসময়—প্রাণময়—জীবন্ত নারীদেহসকল জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইত। বিধাতার বিধানে তাহা অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর এক নূতন অনলের সৃষ্টি হইয়া বিধবার বিষাদময় জীবনকে অল্পে অল্পে—ধীরে ধীরে—পোড়াইতেছে, তাহার নাম তুষানল। সতীদাহে একদিনে জীবনের সকল যাতনা দূর হইত। তুষানলে বিধবা, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে দগ্ধীভূত হন। আজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে এই অসহ্য যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ করিতে-ছেন। যে সকল বিধবার পিতা মাতা ও ভ্রাতা নাই, তাহা-দের দুঃখ আরও ঘনতর আকার ধারণ করিয়া তাহাদের জীবনকে অশান্তির অনন্ত সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে—কখন উঠিবার আশা নাই। উঃ! কি নিষ্মম ব্যাপার! আর ভাবিব না—ভাবিতে গেলে অনেক কথা মনে আসে—অনেক নূতন ও পুরাতন কথা স্মরণ হইয়া প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলে। নানাপ্রকারে আত্মবিস্মৃত হইতে—কর্ত্তব্যের ঘন ঘন আহ্বানধ্বনিভুলিতে—দূরে ফেলিতে, চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যে প্রাণে কর্ত্তব্যজ্ঞান একবার ভাল করিয়া জাগিয়াছে—যিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানজনিত মধুর আত্মপ্রসাদ একবার অনুভব করিয়াছেন, তিনি কি সহজে কর্ত্তব্যের পথ—ন্যায়ানুষ্ঠানের পথ—বিবেকাদিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? শরৎচন্দ্র চিন্তাবিতাড়িত ও ক্লান্তচিত্তে সংস্কৃত কালেজের সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন, এবং অনেক

ক্ষণ ধরিয়া কত কি ভাবিলেন, তাঁহার বন্ধুরা সকলে চলিয়া গেলেন। তিনি একাকী অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন, অনেক চিন্তা করিলেন। বহু ভাবনার পর মনোরমাকে উদ্ধার করা ও তাঁহার বিবাহ দেওয়ার পক্ষে সাহায্য করাই স্থির করিলেন। কিন্তু কি উপায়ে এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক প্রকার উপায়ের কথা মনে আসিল, কিন্তু কোনটিই তত সহজ এবং সুন্দর বলিয়া বোধ হইল না। শেষে একবার মনোরমাকে দেখিতে যাওয়াই স্থির করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই পরিণাম।

শরৎচন্দ্র এখন এক স্থানে কর্ম্ম করেন, ইচ্ছা করিলেই আর যাওয়া ঘটে না। ঘটিলে হয় ত সেই রজনীতেই যাত্রা করিতেন। পর দিন আফিসে যাইয়া এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়া সাধুহাটী যাত্রা করিলেন। অনন্তসাগর বক্ষঃ যেমন নিরন্তর অসংখ্য লহরীলীলার ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে, একটির পর আর একটি এইরূপে শত শত চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া শরৎ-চন্দ্রের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। এইরূপে পথশ্রমে ও নানা ভাবনার তাড়নায় ক্লান্ত হইয়া সাধুহাটীতে পৌঁছিলেন। মনোরমার মামার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বাহির বাটীতে

কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনেক ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেগো?" স্বর শুনিয়া শরৎ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি মনোরমার মা। তখন তিনি বলিলেন, "আমি শরৎ, আপনাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, বাড়ীর ভিতর এস, আমি বড় বিপদে পড়েছি, যখনই আমার বিপদ পড়ে, তখনই তোমার দেখা পাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধা পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ করিয়া ও আসন্ন বিপদ দেখাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে শরৎচন্দ্রকে বসিতে আসন দিলেন। শরৎ ভয়বিহ্বলচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—বাস্তবিকই বড় বিপদ। মনোরমা শয্যাগত—জীর্ণ শীর্ণ কলেবর—শয্যাতে লুকাইয়া আছেন, দেখিলে মনোরমা বলিয়া বোধ হয় না, বোধ হয় যেন ইহলোক ত্যাগ করার আর অধিক বিলম্ব নাই, নিরাশা সমস্ত মুখমণ্ডলকে ঢাকিয়াছে। চক্ষু মুদিয়া মনোরমা বক্ষোপরি যুগলকর স্থাপনপূর্ব্বক যেন ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন। শরৎ দেখিয়া অবাক। গৃহিণী দুই তিন বার বসিতে বলিলেন, কিন্তু শরৎ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে আস্তে আস্তে মনোরমার নিকটে গিয়া বসিলেন। বিনয়ভূষণ তাঁহার পরমাত্মীয়, তাঁহার ভগ্নী ও জননীকে আপনার লোক বলিয়া মনে করেন; সুতরাং এই পরিবারের এই শোচনীয় পরিণামে তাঁহার প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে, বিশেষতঃ মনোরমার এইরূপ পরিণাম যে তাঁহার উদাসীনতাতে হইতে পারে, তাহাও ত অসম্ভব নহে—তাঁহার মনে এইরূপ ভাব উদয় হওয়াতে, তাঁহার মনের ক্লেশ আরও

গুরুতর আকার ধারণ করিল। শরৎ মনোরমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভগ্নী সংসারে আশা স্থাপনের লোক না পাইয়া, শুভাকাঙ্ক্ষী দাদার নিকট যাইবার আয়োজন করিয়াছেন—অত্যল্পকালমধ্যে প্রিয়বন্ধু বিনয়ভূষণের পরিবারের একটি—অতি আদরের একটি—শেষ একটি, অনন্ত অন্ধকারের সহিত চিরমিশ্রিত হইতে চলিল, একথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয় বেদনা পাইবে—মন ভাঙ্গিবে—সুখ-শান্তি তিরোহিত হইবে,ইহা আর আশ্চর্য্য কি? গৃহিণী মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মনো, মা, তোমার শরৎ দাদা এসেছেন, একবার দেখ।" মৃতদেহে তাড়িতসঞ্চার হইলে যেমন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব দেখা যায়, শরতের আগমন সংবাদে মনোরমার সমস্ত শরীরে সেইরূপ চঞ্চলতা ও উত্তে-জনার ভাব দেখিতে পাওয়া গেল। মনোরমা একটিবার ক্ষীণদৃষ্টিতে তাকাইলেন, আবার আপনাপনি চক্ষের পল্লব মুদিত হইল। তিনি আবার তাকাইলেন, কিছু দেখিতে পাই-লেন না। নয়ন মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিলেন, আবার চাহিয়া দেখিলেন। এবার দেখিলেন, শরৎদাদা কাছে বসিয়া আছেন। একবার চক্ষে চক্ষু পড়িল, আবার নিদ্রিতের ন্যায় চক্ষু নিমী-লিত হইল। দেখিতে দেখিতে বৃহদাকার মুক্তার ন্যায় দুই ফোটা জল নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। শরৎ আপনার চাদর দিয়া মনোরমার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন, "মনোরমা, তোমার অসুখ সারবে, কেঁদনা, আমি এসেছি, ভাল ডাক্তার আনিয়া তোমাকে দেখাইব। তুমি কাঁদ কেন, তোমার অসুখ আরোগ্য হইবে।" বরিষার জলস্রোতের ন্যায় অজস্রধারে প্রবাহিত

অশ্রুতে মনোরমার শুষ্ক মুখখানি ভাসিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি একটু স্থির, একটু গম্ভীর ও শান্তভাব ধারণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি একটু আশান্বিত হইয়াছেন। তখন শরৎচন্দ্র গৃহিণীকে বলিলেন, "মা, এমন ভয়ানক বিপদের দিনে আমাকে কোন সংবাদ দেন নাই কেন?" গৃহিণী বলিলেন, "বাবা তোমাকে পত্র লিখিবার জন্য তুমি যে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলে, মেয়েটা আর তা খুঁজিয়া পাইল না।" শরৎ বলিলেন, "কেন আমি শেষে যে দুখানি চিঠি লিখিয়া উত্তর পাই নাই, তাতেও ত আমার ঠিকানা লেখা ছিল।" গৃহিণী বলিলেন, তোমার শেষ পত্রের উত্তর আমরা দিয়াছিলাম, তার পর আর তোমার কোন পত্র পাই নাই, আমরা অনেকবার তোমার সংবাদ পাবার জন্য পত্র লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু মনোরমা ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া আর পত্র লিখিতে পারিল না। আজ তুমি নিজে এলে ব'লে আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লো, তা না হ'লে, আর দেখা হ'তো না।" তখন শরৎচন্দ্র সাধুহাটী হইতে পত্র না যাওয়ার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং নিজের উদাসীনতার প্রতি শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং সে সময়ে সাধুহাটী আসাটা ঈশ্বরের নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহাও বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। ক্রমে ক্রমে মনোরমার পীড়ার কারণ গুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল যে তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইতে পারে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আঁধারে আলো।

শরতের ছুটি ফুরাইল। আর দুই দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। মনোরমার পীড়ার মাত্রা ভিতরে ভিতরে হ্রাস হইলেও, বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং মনোরমার মা, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই মনোরমার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি করিলে মনোরমা আরোগ্য হইবে, বৃদ্ধা এই ভাবিয়া পাগল হইয়া উঠিলেন। শরৎ বলিলেন, "আমার আর থাকিবার উপায় নাই, আর দুই দিন মাত্র ছুটি আছে, এমন অবস্থায় কি করিলে ভাল হয় ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না।" তখন নিরুপায় হইয়া তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন, "যদি মনোরমাকে লইয়া কলিকাতা যান, তাহা হইলে, আমি আপনাদের থাকিবার ও চিকিৎসার ভাল বন্দবস্ত করিতে পারি, আপনি ছোট কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখুন।" তখন বৃদ্ধা আর কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ খুড়া মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিলে ভাল হয়। শরৎ যাহা বলিতেছেন তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। তিনি সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি কয়েক দিনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া তোমাদিগকে লইয়া নিজে যাইতে পারি তা হ'লে বেশ হয়, নতুবা যাওয়া হইতে পারে না। তখন বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধকে যাইবার

জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ দেখিলেন যে, মেয়েটার ব্যারাম যেরূপ বাড়াবাড়ী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বাঁচিবার আশা নাই, আর বিধবা মেয়ে বেঁচেই বা কি রাজা করবে। তখন আর এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজন কি, বিশেষতঃ কোথায় কি অবস্থায় গিয়া থাকিবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এইরূপ নানাদিক চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ মনোরমাকে লইয়া কলিকাতা যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন মনোরমার মা নিরুপায় হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার একমাত্র সান্ত্বনার ধন—ঐ বিধবা মেয়ে আমার সাম্‌নে ঔষধ বিনা মারা যাইবে! আর আমি বসিয়া দেখিব, তা হবে না। ওর মরার আগে আমি মরিব।" যখন বৃদ্ধ শুনিলেন যে মনোরমার মা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন, তখন তাঁহার প্রাণে বড় ক্লেশ হইল, তিনি বলিলেন, "আমার যত কষ্টই হউক, আমি তোমাদিগকে নিয়ে যাব, চল। আমি বুড়ো হইছি, আর পারিনে ব'লেই যেতে চাইনি, তা এখন দেখিছি, আমি না গেলে, চিরদিন আমার একটা দুর্নাম থাকিবে। আমি যাব, তোমরা কলিকাতা যাইবার সমস্ত আয়োজন কর।" পর দিন বৃদ্ধ তাঁহার বৃদ্ধা ভ্রাতৃকন্যা ও নাতিনীকে লইয়া শরতের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

শরৎচন্দ্র কলিকাতায় তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকেন। দূরসম্পর্ক হইলেও রাম গোপাল বাবু শরৎকে

অত্যন্ত ভাল বাসেন এবং আপনার ছোট সহোদরের মত মনে করেন। তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকেন বাড়ীটি বড় না হই-লেও বাসোপযোগী ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শরৎ বাহির বাটীতে থাকেন। রাম গোপাল বাবু সপরিবারে বাড়ীর ভিতর থাকেন। বাহিরের আর একটি ঘরে রাম গোপাল বাবু নিজে বসিয়া পড়া শুনা ও কাজকর্ম্ম করেন। শরৎচন্দ্র, মনোরমা, তাঁহার মা ও দাদা মহাশয়কে লইয়া সেই বাটীতেই উপস্থিত হইলেন এবং মনোরমার জন্য নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিলেন। সেই ঘরে মনোরমা ও তাঁহার মা, আর রাম গোপাল বাবুর বাহিরের ঘরে মনোরমার দাদামহাশয় রহিলেন। শরৎ বাসায় আহারাদি করিয়া কোন বন্ধুর বাসায় গিয়া শয়ন করেন। পরিচয়ে বৃদ্ধ জানিতে পারিলেন যে, রামগোপাল বাবু তাহাদের কুটুম্ব হন, ডাক্তার আনাইয়া মনোরমার চিকিৎ-সার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু কোন উপকার বোধ হইল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া সহরের কোন খ্যাতনামা কবিরাজকে আনাইলেন। পীড়ার অবস্থা পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিয়া কবিরাজ ঔষধের ব্যবস্থা করি-লেন এবং বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আরোগ্য হইবে, তবে একটু সময় লাগিবে।" তখন সকলে একটু আশা পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং কবিরাজের আদেশ মত সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, সেই দিকে সকলের দৃষ্টি রহিয়াছে।

এইরূপে প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল, মনোরমা অল্পে অল্পে আরোগ্য হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন, সেই

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের উৎসাহও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তি ফিরিয়াছে—কোন বিষয়ে কিছু ভাবিলে, কোন ক্লেশ হয় না। সমস্ত দিন শয্যাতে শয়ন করিয়া পড়া শুনা করেন, আর কল্পনাতে নিজের মনের মত কত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার শোভা নিজে নির্জ্জনে সম্ভোগ করেন। তিনি নিরাশার অন্ধকারে আশার অস্ফুট আলোক দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। তাঁহার পীড়ার প্রকোপও দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও তাঁহার উত্থান শক্তি নাই। কবিরাজ বলিয়াছেন, আর কয়েক দিন এইরূপে চিকিৎসা চলিলে, মনোরমা উঠিয়া বসিবেন, আর ভাবনা নাই। এমন সময়ে বাড়ী হইতে বৃদ্ধ এক পত্র পাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, আগুন লাগিয়া বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, অনেক টাকা কড়ি ও জিনিস পত্র নষ্ট হইয়াছে ও অবশিষ্ট চুরি গিয়াছে। বিষয়সম্পত্তির অনেক দলিল পত্র ও টাকা ধার দেওয়ার অনেকগুলি খত পুড়িয়া গিয়াছে। পত্র পাঠমাত্র তাঁহাকে বাড়ী যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। পত্র পাইয়া বৃদ্ধ বড় বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া আরও বিপদে পড়িলেন। অনেকচিন্তার পর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে,আপাততঃ বাড়ী যাওয়া আবশ্যক, পরে প্রয়োজন হইলে আবার আসিবেন, আর ইত্যবসরে মনোরমা আরোগ্য হইলে, শরৎচন্দ্র তাঁহাকে ও তাঁহার মাকে রাখিয়া আসিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সেই দিনই গৃহে গমন করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত সরলতা।

যত দিন যাইতে লাগিল, মনোরমা ততই অল্পে অল্পে আরোগ্য হইতে লাগিলেন, প্রায় দুই সপ্তাহকাল অতীত হয়, এমন সময়ে শরৎচন্দ্র একদিন আফিস হইতে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা উঠিয়া বসিয়াছেন। শরৎ বিস্মিত অথচ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "মনোরমা, তোমার দুর্ব্বল শরীর, এখনও ভাল হইয়া আরাম হও নাই, তুমি কেন উঠে বস্‌লে?" মনোরমা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি আজ খোকার মার ঘরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার শরীরে বেশ বল পাইতেছি। এ সময়ে আপনি যদি সাধুহাটিতে না যেতেন, আর যদি আমাকে কলিকাতায় না আনিতেন, তা হ'লে আমি নিশ্চয় মরিতাম, আর তা হ'লে আমার মার কি দশা হ'তো! আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা শোধ দিবার নহে। যে দিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 'মনো, তোমার শরৎ দাদা আসিয়াছেন,' সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার রোগ তিল, তিল করিয়া আরোগ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার অসুখের কারণ আপনি, আবার তাহা ভাল হওয়ার কারণও আপনি। আপনি যখন আমাদিগকে সাধুহাটীতে রাখিয়া আসিলেন, তখন আমাদের আশা ভরসা সকলই আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল। আমি প্রত্যহ আপনার কথা ভাবিতাম। আপনার

পত্র পাইলে, কত আনন্দ হইত তাহা বলিবার নহে; কিন্তু যখন আপনার পত্র পাওয়া বন্ধ হইল, তখন হইতেই আমার ভাবনা বাড়িতে লাগিল। ভাবিতাম আজ হয়ত শরৎদাদার পত্র আসিবে, ক্রমে একদিন দুদিন করিয়া কত দিন গেল, কিন্তু পত্র আর গেল না, আবার মনে নানা ভাবনার উদয় হইতে লাগিল, কত কি ভাবিয়াছি, তাহার ঠিকানা নাই। ভাবিতে ভাবিতে আমার অসুখ হইল—অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল—এমন সময়ে আপনি আমাদিগকে দেখিতে গেলেন। শরৎ বলিলেন, "মনোরমা, তুমি আমার জন্য এত ভাবিয়াছ যে তোমার অসুখ হইল; আমার জন্য কেন এত ভাব্‌লে?"

মনো। মা আপনাকে ভাল বাসেন,—আমি আপনাকে ভাল বাসি—আপনাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করি,—আমার দাদার মত ভাল বাসি, তাই আপনার জন্য ভাবিতাম।

শরৎ। মনোরমা, মা কোথায়?

মনো। মা খোকার মার ঘরে ব'সে গল্প করছেন।

শরৎ। মনোরমা, এই অবসরে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তুমি কি তার উত্তর দিবে?

মনো। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, বাধা না থাক্‌লে উত্তর দিব।

শরৎ। তোমার দাদার স্ত্রী তোমার জন্য আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করার এই প্রশস্ত সময়, আমি কি তোমার জন্য চেষ্টা করিব?

মনো। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ভূমিদৃষ্টিতে আস্তে

আস্তে বলিলেন, আমি জানি না, আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।

শরৎচন্দ্র মনোরমার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ, কি উপায়ে তোমার মায়ের সম্মতি পাই তাই ভাবিতেছি, তুমি কি কোন উপায় বলিয়া দিতে পার?" এমন সময় মনোরমার মা তথায় আসিলেন। শরৎ আসিয়াছেন দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, আজ আমার মনো, উঠিয়াছে। তোমার গুণেই কেবল আমার মেয়েটা এবার বাঁচিয়া গেল।" কত মিষ্ট কথায় মঙ্গলকামনা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া শরৎকে হাত মুখ ধুতে বলিলেন। শরৎ রামগোপাল বাবুর বৎসরাধিক বয়স্ক বালককে ডাকিতে ডাকিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। গৃহপ্রবেশ করিয়া করতালি দিতে দিতে খোকাবাবুর নিকটে গেলেন। খোকাবাবু শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, সুতরাং ডাকিতে না ডাকিতে হামা দিয়া শরৎ বাবুর নিকটে আসিলেন এবং হাঁটুর উপর বসিয়া গোল গোল হাত দুখানি একত্র করিয়া নিঃশব্দে দুইবার করতালি দিলেন। সে করতালি যে দেখিল, সেই শুনিল," যে দেখিল না, সে অভাগা এ স্বর্গীয় সুমধুর ধ্বনি শুনিতে পাইল না। খোকাবাবু তারপর একবার হাত মুখ নাড়িয়া, বক্তার বক্তৃতার ন্যায়, পাগলের পাগলামির ন্যায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী, ফার্সি প্রভৃতি বহুবিধ ভাষা একত্রিত করিয়া, কোন এক অজ্ঞাত ভাষায় একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। শরৎ বাবু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পূর্ণিমার চারুচন্দ্র-

সদৃশ সুগোল ও সুন্দর গণ্ডে চুম্বন দিয়া বলিলেন, "শশধর, তোমার ও অমৃতলহরী ধার্ম্মিকের মনে ধর্ম্ম, কবির মনে কল্পনা উদ্দীপিত করিয়া দেয়, কিন্তু আমি অধম, মূর্খ, তোমার ও দেশী বিলাতী বক্তৃতা কিছুই বুঝিলাম না।" এই বলিয়া আবার সেই কুসুম-স্তবক-সম শোভনীয় মুখে স্নেহচুম্বন দিলেন। শরৎ বাবু খোকাকে কোলে লইয়া খোকার মায়ের কাছে গেলেন। খোকার মা তখন জল খাবার প্রস্তুত করিতে ছিলেন। শরৎ বাবু তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বৌউ ঠাকুরুন্ আজ আমাদের কি খেতে দেবেন?"

খো, মা। মোহনভোগ আর লুচি।

শরৎ। দেখুন, আজ আমি আপনাকে একটি বিশেষ কাজের ভার দিব। আপনি সেই কর্ম্মটি করিতে পারিলে, আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

খো, মা। কি কাজ বল না, আমার সাধ্য থাকিলে করিব।

শরৎ। মনোরমার মনে মনে বিবাহের ইচ্ছা আছে, আর তাহার মত বালিকাবিধবার পক্ষে এরূপ ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সমস্বরে বলিয়া দিতেছে যে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার সাহায্য ভিন্ন একাজটি সম্পন্ন হয় না। আপনি মনোরমার মাকে একথা বলুন, এবং যাহাতে তাঁহার মত হয় তাহা করুন্। আমি একটি বর ঠিক করিয়াছি, যদি তাঁহার মত করিতে পারেন, তাহা হইলে, সেই বাবুটিকে একদিন আমাদের বাসাতে আনি।

খো, মা। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আচ্ছা যদি আমি

মনোরমার মার মত করিতে পারি, তা হ'লে তুমি আমাকে কি দিবে বল ?

শরৎ। আমি গরিব লোক, কোথায় কি পাব বলুন ? তবে মনোরমার বিবাহ হইলে, এক বেলা, কি এক দিন দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া নিমন্ত্রণ খাইবেন।

খো, মা। পোড়াকপাল, এক বেলা কি দুবেলা পেট ভ'রে নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে এত খাট্‌তে পাব্‌বো না। তবে আমা হতে হবে না, তুমি অন্য লোক দেখ।

শরৎ। খোকাকে নাচাইতে নাচাইতে, দেখ, তোমার মা ত নিমন্ত্রণে, লুচির নামে, সন্দেশের নামে ভুলেন না। ওহে পাকা ঘটক, তুমি তবে এই ঘট্‌কালিটা কর। আবার খোকার মাকে বলিলেন, দেখুন, তামাসা না, আপনাকে একার্য্য করিতেই হইবে।

খো মা। আমার দ্বারা যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এখন কেবল তোমার কাজ বাকি আছে।

শরৎ। সে কি, আপনার সঙ্গে কি কোন কথা হ'য়েছিল ?

খো, মা। আমার সঙ্গে সমস্ত কথাই হয়েছে।

শরৎ। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি কি কথা হয়েছে বলুন না।

খো, মা,। সকল কথা তোমাকে বলিতে বাধা আছে। বলিব না, তবে যদি কৃপণতা ছাড়িয়া কিছু টাকা খরচ করিতে পার, তা হ'লে বলি।

শরৎ। আচ্ছা, কর্‌ব।

খো, মা। বল, কত খরচ করবে? দুই চারি পয়সার কাজ নয়।

শরৎ। কত বলুন।

খো, মা। অন্ততঃ ৩০০ টাকা। পারবে?

শরৎ। কেন, এত টাকা কি হবে?

খো, মা। ঘরে মশা হয়েছে, ধোঁয়া দিতে হবে।

শরৎ। তামাসা না, বলুন না।

খো, মা। একছড়া চিক্, একজোড়া বালা, এক খানি ভাল কাপড়, আর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানার জন্য, ৫০ টাকা, খুব কম্ করে এতে সারা যাইতে পারে।

শরৎ। আপনার সহিত বৃদ্ধার কি কি কথা হ'য়েছিল বলুন না?

খো, মা। মনোরমার বিবাহ এক প্রকার ঠিক হ'য়ে গিয়েছে—তাহার মায়েরও মত হ'য়েছে।

শরৎ। কোথায় ঠিক্ হইল।

খো, মা। আমাদের বাবুর সন্ধানে একটি বর আছে, তাঁহার সহিত বিবাহে কাহারও অমত হবে না। মনোরমার মার খুব মত আছে, মনোরমারও মত হবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে বাবুটির এখনও পরিষ্কার মত পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় সে বাবুরও অমত হবে না। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, মনোরমা কি মন্দ মেয়ে?

শরৎ। মনোরমা রূপেগুণে সুন্দরী। অমন মেয়ে অতি অল্পই দেখা যায়। বড় দাদা যে বাবুটির সঙ্গে মনোরমার বিবাহ ঠিক করিতেছেন, আপনি কি তাঁকে জানেন?

খো, মা। আমি তাঁকে বেশ জানি, অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখ্‌চি। তিনি বড় ভাল লোক। আমি এখনই তোমাকে তাঁর নাম বলিতে পারি, আর নাম বলিলে, তুমি তাঁকে বেশ চিনিতে পারিবে। আচ্ছা বল দেখি, দেখ্‌তে শুন্‌তে, লেখা পড়াতে, সাংসারিক অবস্থাতে ঠিক্ তোমার মত একটি বাবুর সহিত মনোরমার বিবাহ হইলে, তুমি কি সুখী হও না?

শরৎ। এসকল বিষয়ে আমার মত বা আমাপেক্ষা হীন হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার অপেক্ষা তাঁহার ভাল লোক হওয়া আবশ্যক—চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন উন্নত হওয়া চাই। আমার ন্যায় নিকৃষ্ট জীবন যার, তেমন লোকের সহিত এই অতুলনীয়া গুণবতীর বিবাহ হওয়া আমার মতে অন্যায়।

খো, মা। তোমার ঐরূপ অবস্থার লোকেতে উন্নত চরিত্র আর ধর্ম্মজীবন থাকিলে, তোমার কোন আপত্তি হইবে না?

শরৎ। না, তাহলে আর আপত্তি কেন হবে?

এমন সময়ে রামগোপালবাবু আফিস হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার আগমনে শরৎ ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন, তিনি খোকাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। শরৎ বাবুর সহিত খোকার মার যে সকল কথা হইয়াছে, তিনি এই অবসরে খোকার বাপের নিকট সে সমস্ত প্রকাশ করিলেন। রামগোপালবাবু স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, "তাইত তুমিও দেখি বড় সহজ লোক নও, তোমার ভিতরে এত আছে, আমি তা জান্‌তাম না। শরৎ

বুদ্ধিমান লোক, তাহার সহিত তুমি এত চাতুরি করিলে! শরৎ যখন জানিতে পারিবে যে তুমি তাহার সহিত এইরূপ কৌতুক করিয়াছ, তখন সে কি মনে করিবে? খোকার মা বলিলেন, "শরৎ আমার দেবর হয়," তাকে একটু হারাইয়া দিয়াছি, আমার খুব আনন্দ হইতেছে, এমন সময় শরৎচন্দ্র খোকাকে নাচাইতে নাচাইতে সেই খানে আসিলেন। রামগোপালবাবু শরৎবাবুকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "শরৎ মনোরমার বিবাহের জন্য কোথায় বর ঠিক করিয়াছ?" শরৎ তাঁহার সঙ্কল্পিত পাত্রের গুণাগুণ ও অবস্থা বলিয়া,তাঁহার নামোল্লেখ করিলেন, তখন রামগোপালবাবু বলিলেন, "তিনি পাত্র মন্দ নহেন. তবে আমরা যে পাত্র, ঠিক করিয়াছি, সে পাত্র সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, আর আমাদের প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে তার মার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তবে তোমার ইচ্ছা না হ'লে সে কার্য্য হইবে না।" শরৎ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কেন, আমার অমত হবে, আর আমার মত নাই হ'লো, তাতেই বা ক্ষতি কি? আপনারা যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, সেই পাত্রে বিবাহ দিতে মনোরমার মার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, মনোরমার ও ইচ্ছা হইবে, তবে আর আমার আপত্তি হবে কেন? সে পাত্রের মতামত কি জানা হইয়াছে?" তখন রামগোপাল বাবু একটু হাসিয়া শরৎকে লইয়া জল খাইতে বসিলেন এবং বলিলেন, "আমরা জানি যে, আমরা যে পাত্র স্থির করিয়াছি, মনোরমার তাতে আপত্তি হবে না, বরং বিশেষ আগ্রহ দেখাইবে, আর পাত্রটিও প্রকারান্তরে নিজের মত দিয়াছেন। এখন বল দেখি,তোমার সম্পূর্ণ

সম্মতি আছে কি না?” শরৎ বলিলেন, “অবশ্যই আছে।” খোকার মা শরৎবাবুর এই সম্মতিদানে হাসিয়া আটখান হইয়া পড়িলেন। তখন রামগোপালবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমাদের নির্ব্বাচিত পাত্র অপর কেহ নহেন আমাদেরই শরৎচন্দ্র।” শরৎচন্দ্র এতক্ষণ খুব উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু যেই শুনিলেন যে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত বর অপর কেহ নহে, তিনিই স্বয়ং, তখন মেঘাক্রান্ত সূর্য্যের ক্ষীণতা প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহার সমস্ত তেজ যেন অপহৃত হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন? কথাটি শরৎচন্দ্রের মনে কি ভাবের উদয় করিয়া দিল? যিনি কখন এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। সে ভাব কল্পনার অতীত —কল্পনাবলে কেহ তাহা অনুভব করিতে পারেন না—চিত্রকর যতই সুন্দররূপে তুলি ধরুন না কেন—যতই মনমোহন চিত্র অঙ্কিত করুন না কেন—এভাবের মধুরতা স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্র চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন—কর্ণে কিছু শুনিতে পাইলেন না—মনে কিছু ধারণা করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি জড়ের মত বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার মনে এক সুকঠিন প্রশ্নের উদয় হইল। সে প্রশ্ন এই যে, এ বিবাহ করিবেন কি না। এই গভীর চিন্তাতে মন প্রাণ মগ্ন হইল। শরৎচন্দ্র ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও জানিতেন না যে, মনোরমাকে বিবাহ করিয়া, তাহার অস্তমিত আশা-নক্ষত্রকে পুনরুদিত করাইবেন। মনোরমাকে ভগ্নীর ন্যায় দেখিবেন ও স্নেহ ভালবাসা দিয়া,

চিরকাল সুখী হইবেন, এই আশাই মনে মনে পোষণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মনোরমার অনুরাগ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া মরনান্ত কাল পর্য্যন্ত প্রেমের স্রোতে জীবন-তরী ভাসাইতে হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। শরৎচন্দ্র ভগ্নস্বরে রামগোপালবাবুকে বলিলেন, "মনোরমা সুপাত্রী, কিন্তু আমি তাহার উপযুক্ত বর হইব কি না, জানি না, বিশেষতঃ আমি তাহাকে বিবাহ করিলে, আমাতে স্বার্থপরতা স্থান পায়, সুতরাং আমি খুব চিন্তা করিয়া দেখিব। আমার ইচ্ছা মনোরমার বিবাহ অন্যত্র হয়।

তখন রামগোপালবাবু বলিলেন, "মনোরমার মা অন্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। তিনি কেবল তোমারই সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত আছেন।" শরতের নিকট বিষয়টি আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। তিনি বলিলেন, "আপনারা আমাকে বড় বিপদে ফেলিলেন," এই বলিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এত লজ্জা কেন ?

মনোরমা এখন বেশ আরোগ্য হইয়াছেন, এখন এঘর ওঘর যান—একাজটি ওকাজটি করেন—শরীরে বেশ বল পাইয়াছেন, মুখে বেশ উৎসাহের লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছে। শরৎচন্দ্রকে তিনি বড় ভাল বাসেন। যতই তিনি শরৎচন্দ্রকে জল দিতে—পান দিতে যান—যতই শরৎচন্দ্রের নিকটে বসিয়া দুইটি মিষ্ট কথা শুনিতে—একটু উপদেশ পাইতে, ব্যস্ত হন, শরৎ বাবু ততই লজ্জিত—ততই কুণ্ঠিত—ততই চোরের মত হইতে লাগিলেন। তিনি আর মনোরমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কন না—মনোরমাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় হাসি মুখে ডাকেন না—তিনি যেখানে থাকেন শরৎচন্দ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ব্যস্ত হন, মনোরমা শরতের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে নানা ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণে একাকী বসিয়া মনোরমা ভাবিতেছেন—তাইত আমি কি এমন কোন অন্যায় কাজ করিছি যে, শরৎ দাদা সেই জন্য আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন না, না, আমাকে আর ভাল বাসেন না ? শরৎ দাদা আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করিলে, ভাবিয়া ভাবিয়া আমার ত আবার অসুখ হইবে। আজ তিনি আসিলে, আমি জিজ্ঞাসা করিব, তিনি কেন আমার

সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কন না, কেন অমন জড়সড় হয়ে থাকেন। এমন সময়ে খোকার মা খোকাকে লইয়া সেই ঘরে আসিলেন। তিনি মনোরমাকে গালে হাত দিয়া ভাবিতে দেখিয়া বলিলেন, "মনোরমা, কি ভাবিতেছ ? তোমার মা যে তোমার বিবাহ দিবেন।" মনোরমা একটি বার খোকার মার মুখের দিকে তাকাইয়া একবারে জড়সড় হইয়া রহিলেন—মাথা হেঁট করিয়া নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। খোকার মা মনোরমাকে যতই মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে বলেন, তিনি ততই লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিয়া থাকেন দেখিয়া খোকার মা বলিলেন, "মোনো, আমার কাছে 'এত লজ্জা কেন ?' আমি তোমার চেয়ে কত বড় হবো ? আমাকে বড় দিদির মত মনে কর্‌বে। আমি তোমাকে আমার ছোট বো'নের মত মনে করি, আমাকে সব মনের কথা বল্‌বে, মনে যখন যা হবে, আমাকে বল্‌বে। মনোরমা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?" মনোরমা বলিলেন "করুন।" খোকার মা বলিলেন, "শরৎ বাবুকে তুমিত খুব ভাল বাস, শরৎবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'লে কেমন হয় ?" কথাটি মনোরমার কাণে কেমন লাগিল ? চঞ্চলা চপলা ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া—অনন্ত বিস্তৃত গগণপটকে মুহূর্ত্তেকের জন্য শুভ্রবর্ণ তীব্রালোকে আলোকিত করিয়া—আবার সেই জলদজালের ক্রোড়ে লুক্কাইত হইলে—সমগ্র ধরা যেমন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হয়, মনোরমার হৃদয়প্রাঙ্গনও তদ্রূপ এ শুভসংবাদের তীব্র জ্যোতি ধারণ করিতে অসমর্থ

হওয়ায় তিনি চারিদিক আঁধার ও অবলম্বনশূন্য দেখিলেন। তখন সে অবলাহৃদয়ে কি ব্যাপার চলিতেছিল, তাহা কে বুঝিতে পারিবে—কে তাহা বলিতে সক্ষম হইবে—সে নিরাশময় জীবন-প্রান্তরে এ আশার কথা—নিষ্ঠুর সংসারের নির্ম্মম ব্যবহারের ভিতরে শান্তি ও সুখের বার্ত্তা!—মনোরমার নিকট আজ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—সংসার-মরুভূমে আজ তিনি শান্তি-বৃক্ষ-মূলে সুখের ছায়াতে বসিবার আশা পাইলেন। মনোরমা আত্মহারা হইয়া নত দৃষ্টিতে আনন্দের ঘাত প্রতিঘাতজনিত নেত্রনীরে গৃহতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। খোকার মা বুঝিলেন যে ইহাই মনোরমার হৃদ্গত বাসনা।

খোকার মা মনোরমাকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তখন মনোরমা দেখিলেন যে অজ্ঞাতসারে যে, আশা-নক্ষত্র তাঁহার হৃদয়াকাশ-প্রান্তে অলক্ষিতভাবে উদয় হইয়া এতদিন স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতেছিল, আজ তাহা মাথার মুকুট—শিরোভূষণ হইয়া তাঁহাকে সংসার-জীবনে শোভাপূর্ণ ও ধর্ম্মপথে সহায়তা করিতে আসিতেছে—তিনি ইহা স্মরণ করিয়া শত শত বার বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

কোমলপ্রাণা বালবিধবার বিষাদময় জীবন-ক্ষেত্রে যে কি ভয়ঙ্কর যাতনার আগুন অহরহ জ্বলিতেছে, তাহা কে বুঝিবে? ইন্দ্রিয়ের দাস, স্বার্থপর লোক কি কখন অন্যের দুঃখ কষ্টের পরিমাণ করিতে পারে? যাঁহাদের হৃদয় আছে—ধর্ম্মজ্ঞান আছে—যাঁহারা স্বার্থশূন্য হইয়া বিষয় বিশেষের তত্ত্ব নিরূপণে সক্ষম, তাঁহারা বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া—লোকসেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া—আত্মপর

বিচার শূন্য হইয়া—স্বার্থপরতা বিস্মৃত হইয়া, কৃতার্থ হন। কিন্তু সংসারে এমন লোক কয় জন মিলে? খৃষ্টের ন্যায় কর্ম্মশীল প্রেমিক—বুদ্ধের ন্যায় বৈরাগী প্রেমিক—চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত প্রেমিক কয় জন মিলে? ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুরোধে—সত্যের সেবার অনুরোধে—কয় জন লোক সমাজ-শাসনের অতীত হইতে পারিয়াছেন? তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারের মুখকে উজ্জ্বল করিয়াছেন—সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আর সেই সমাজই ধন্য—সেই সমাজই বাসোপযোগী,—সেই সমাজই মানুষকে মহৎ করিতে পরম সহায়, যেখানে বাস করিয়া, সত্যের সেবা করা—ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হওয়া সহজ।

যেখানে লোক সুখের শয্যাতে শয়ন করিয়া রূপের কলস গলায় বান্ধিয়া অবসন্ন শরীরে নিদ্রিত—যাহারা কোন বিষয়কে বুঝিয়াও বুঝে না—সত্য বলিয়া জানিয়াও তাহার আচরণ করে না, তাহারা স্বাধীনচেতা হইবে, শুনিলে হাসি পায়। নিজের পরিবার পরিজনের কাহার কি অভাব আছে—কাহাকে কোন্ পথে চালাইলে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, তাহা যাহারা ভাবে না—ভাবিতে চায় না, তাহারা সমাজ গঠন করিবে—স্বাধীন হইবে—মানুষের প্রতি অপক্ষপাত বিচার করিবে,একথা কাহাকেও বলিতে শুনিলে,মনে হয় ইহা পাগলের পাগলামি। স্বপ্নেতে—কল্পনাতে সত্য থাকিতে পারে—অগ্নি শীতল হইতে পারে—অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় হইতে পারে, এমন সকল অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইলেও হইতে পারে,কিন্তু এরূপ অলস, উদাসীন ও স্বার্থপর লোক

দ্বারা পরিবার সুরক্ষিত ও সুপরিচালিত হইতে পারেনা—কোন সমাজ উন্নতির পথে এক তিল অগ্রসর হইতে পারে না—কোন দেশের স্বাধীনচিন্তা এক কণাও বৃদ্ধি হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে মনোরমার ন্যায় অন্ততঃ ধর্ম্মত কুমারী বালিকাদিগকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইতে সমাজ এত ব্যস্ত হইতেন না। যে অনুরাগের রেখা মনোরমার প্রাণে অঙ্কিত হইয়াছে, যাহার চিন্তামাত্র তাঁহার জীবনকে উন্নত, আশাপূর্ণ ও কর্ম্মপরায়ণ করিতেছে, বঙ্গের কত শত শত মনোরমার এই রূপ অনুরাগের অঙ্কুর সমাজের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করে? এই জন্যই বলি, এদেশের কলঙ্ক ভার কখন অপনীত হইবার নহে—ভাবী ইতিহাসের পত্রে পত্রে আমাদের দুর্দ্দশার কথা লিখিত থাকিবে।

ন্যায়বান ঈশ্বরের সম্মুখে এ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের হিসাব দিতে হইবে—ন্যায়ান্যায় তুলাদণ্ডে বিচার হইবে, একবার কি এ কথাটি শয়নে স্বপনেও মনে পড়ে না? ধর্ম্মের কথা—কর্ত্তব্যের কথা—পরলোকের কথা যদি মনে উদয় হয়, তবে সত্যের অনুরোধে—ন্যায়ের অনুরোধে—সহৃদয়তার অনুরোধে, আজ আসুন সকলে একত্র হইয়া ঐ বৃদ্ধার ন্যায় সংখ্যাতীত বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন আশালতার মূলে জল সেচন করি। ঐ যে বৃদ্ধা চারিদিক হইতে অভাবের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন—একমাত্র কন্যা—জীবনের অবলম্বনকে সুখের গৃহে—শান্তির ক্রোড়ে বসাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, আসুন আমরা উহাঁর আনন্দে যোগ দিয়া উহাঁর আনন্দকে ঘনতর—মধুরতর করিয়া দিই।

খোকার মা মনোরমাকে এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে শরৎচন্দ্র আফিস হইতে আসিলেন। গৃহপ্রবেশ করিতে করিতে তিনি যাহা কিছু শুনিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিলেন যে মনোরমার বিবাহের কথাই হইতেছিল। তিনি গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র খোকার মা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট গেলেন। মনোরমা পূর্ব্বের ন্যায় আর শরৎচন্দ্রের নিকটে গেলেন না। তিনিও আজ জড়সড়—আজ তিনি শরৎচন্দ্রের মত লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া গৃহের বাহিরে গেলেন। খোকার মার সহিত কথা বার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে, তিনি যে ভাবিতেছিলেন "শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র মিত্রের কৈফিয়ত তলব করিবেন" তাহা আর হইল না, শেষটা "উলটো বুঝ্‌লি রাম," হইয়া গেল। আজ হইতে এক নূতন ভাব—নূতন আশা—নূতন চিন্তা, তাঁহার মন প্রাণকে অধিকার করিল। মনোরমা শরৎবাবুকে আর জল দিতে—পান দিতে, যান না—আর তাঁহার নিকটে বসিতে চান না—মিষ্ট সম্ভাষণে আর তাঁহাকে ডাকেন না, সত্য, কিন্তু অনুরাগে আকৃষ্ট প্রাণের বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতে লাগিল। উভয়েই উভয়কে পাইবার জন্য অন্তরে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন—পরস্পরকে সুখী করিবার বাসনা তাঁহাদের মনে প্রবল হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কল্পনাতে তাঁহাদের ভাবী জীবনক্ষেত্রে আশার গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। বহুবিধ বাসনার মধ্যে তাঁহাদের প্রাণে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছে—সেটি এই যে তাঁহাদের সম্মিলিত জীবনের প্রবলতর স্রোতঃ কেবল নির্জ্জন বনভূমি ভাসাইয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইবে এরূপ নহে, কিন্তু এ বিবাহে

যে পরিবারের সৃষ্টি হইবে তাহার সুশীতল ছায়াতে বসিয়া বন্ধুবান্ধব,আত্মীয় স্বজন ও ঈশ্বরের বিপন্ন সন্তান প্রাণ জুড়াইতে পারেন—শান্তি অনুভব করিতে পারেন—অতিথী আশ্রয় পান—পীড়িতের সেবা হয়—সন্তপ্ত জন সান্ত্বনা পান, এই চিন্তাই তাঁহাদের ভাবী জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। অপরকে সুখী করিবার প্রবলতর আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া সংসার-জীবনে প্রবিষ্ট হইলে, সংসারের কি আশ্চর্য্য কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা ইহাঁদের ভাবী জীবনে প্রতিফলিত হইবে।

উপসংহার।

কন্যার অনুরোধে গৃহিণী তাঁহার বৈবাহিক ও পুত্রবধূকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আদরের ধন প্রেমমালার অনুরোধে বাধ্য হইয়া এবং বিধবাবিবাহে সহানুভূতি থাকায় বিনয়ের শ্বশুর কন্যাসহ মনোরমার বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন।

আজ মাঘমাসের বিংশতিতম দিবসে মনোরমা বৃন্তচ্যুত আশা-পুষ্পকে পুনরায় বক্ষে উঠাইয়া লইতে আহূত হইলেন। যে শতদল-বিনিন্দিত মুখপদ্ম বিকসিত হইয়াও এতদিন ম্লান ভাবে ছিল—আজ সুসময় পাইয়া প্রস্ফুটিত ও পূর্ণ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া নিকটস্থ সকলের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

প্রেমমালা পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছেন। পূর্ব্বে কখন কলিকাতা দেখেন নাই। আজ ননন্দিনীর বিবাহের আয়োজনে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বিকাল বেলা মনোরমাকে লইয়া গৃহের ছাতের উপর উঠিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণ্য অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সহরের অনন্ত সৌন্দর্য্য ও শোভা সম্পাদন করিতেছে—রাজ পথের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীবদ্ধ আলোক স্তম্ভসমূহে সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হইয়া অসংখ্য হীরকখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—দেখিলে বোধহয় যেন পৌরাণিক অমরাবতী কল্পনার ছায়া অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কলিকাতাতে পরিণত হইয়াছে। খোকার মা বাপের সাহায্যে ছাতের উপর হইতে মনোরমা অনেক সময় নিজ কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন,তাই আজ তিনি প্রেমমালাকে, কলিকাতার অনেক সংবাদ দিতেছেন। অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট ও সুপ্রবীণ হাইকোর্ট উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান, তাহা দেখাইলেন —যে সকল প্রবাদ বা ভাব ঐ সকল ও ঐরূপ অন্যান্য ইংরাজ কীর্ত্তির সহিত সংসৃষ্ট আছে, আর সে সম্বন্ধে যাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা যথাবৎ উল্লেখ করিলেন। কিছু দূরে একটি বাড়ীর অন্তরালে স্থাপিত আর একটি বাড়ীর কতক অংশ অঙ্গুলীদ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটী", উহার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দরিদ্র ছাত্রগণকে অন্ন দান করার কথাও উল্লেখ করিলেন। তাহারই অনতিদূরে লংসাহেবের গির্জ্জাঘর দেখাইয়া সাহেবের লোকানুরাগ ও এদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কথা উল্লেখ করিলেন। তিনিই নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। এমন সময়ে খোকার মা হাসিমুখে তথায় আসিলেন। খোকার মা মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ আজ আর এ দিক ও দিক করিয়া বেড়ান ভাল দেখায় না। বিয়ের ক'নে শান্ত হয়ে এক ঘরে গিয়ে ব'সে থাক।" এই বলিয়া সকলে একত্র হইয়া নীচে আসিলেন। প্রেমমালা অন্যান্য মহিলাদের সহিত একত্র হইয়া সাধের ননদিনীকে নূতন বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহসভা প্রস্তুত হইয়াছে, কতকগুলি বন্ধুপরিবেষ্টিত হইয়া শরৎচন্দ্র অন্য কোন বন্ধুর বাটী হইতে আসিয়া বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খধ্বনি বরের শুভাগমন সংবাদ প্রচার করিলে, সকলে তাঁহাকে লইয়া বরসভায় বসাইয়া দিলেন, যথা সময়ে কন্যাকেও বিবাহের স্থানে আনা হইল। এই মুহূর্ত্ত হইতে শরৎচন্দ্র ও মনোরমা ভাবী জীবনের গভীর দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া চিন্তিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং বিনীত ভাবে বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালনের ভার গ্রহণে অগ্রসর হইলেন, আজ নবদম্পতীর শুভযোগ সকলের প্রাণে যে আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছে; বিবাহান্তে বিনয়-শোকে অধীরা ও শোক-জর্জ্জরিতা বৃদ্ধা জননীর ক্রন্দন ধ্বনিতে সে আনন্দধারা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল। সকলেরই চিত্ত বিষাদিত হইল—সকলেই আজ এই আনন্দের দিনে নিরানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

সুখের সময়ে দুঃখের কথা স্মরণ হইলে যে কি গভীর যাতনার উদয় হয়, তাহা কেবল তিনিই বুঝিবেন, যিনি সুখের আস্বাদন অপেক্ষা দুর্দ্দিনে দুঃখের কশাঘাতে অধিক ক্ষত

বিকৃত। সামান্য সুখের অভ্যুদয় হইবামাত্র পর্ব্বত প্রমাণ দুঃখ সন্তাপ আবির্ভূত হইয়া সুখ-কণাকে আপন ক্রোড়ে লুক্কাইত করে, এই জন্যই অনেক লোক দুঃখের কালিমাময় চিত্র সকল স্মরণ করিয়া সুখের সময়েও সুখানুভব করিতে পারে না। আর এই কারণেই আজ আনন্দের দিনে বৃদ্ধা অশ্রুজলে ভাসিতেছেন ও আত্মীয়স্বজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে ঘরে লইয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র ও মনোরমা সংসারের এই দুটি পবিত্র যুগল বিধাতার বিধানে মিলিত হইল। তাঁহারই কৃপায় ইহাঁরা সুখ শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। এই আর একখানি ছবি।

সম্পূর্ণ।